

[illegible]

বুলগেরিয়ার কবিতা

মূল-ভাষা থেকে অনুবাদ

অরুণ দাশগুপ্ত

মিত্রালয়
১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বুলগেরিয়ার কবিতা
(An anthology of Bulgarian Poetry)

মূলভাষা থেকে অনুবাদ
অরুণ দাশগুপ্ত (c)

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী ১৯৭২

মূল্য : ১০.০০

প্রচ্ছদপট :
ইন্দু মুখার্জী

লিপি : অহিভূষণ মালিক

মিত্রালয় ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট কলি-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও কার্ডিন্যাল প্রিণ্টার্স ৪/১এ সনাতন শীল লেন কলি-১২ হইতে শিবব্রত সিংহ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বুলগেরিয়ার কবিতা

বাংলাদেশের
মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

* ভূমিকা *

আমাদের শতকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবর্তনায় একদা বাংলায় অনুবাদ-কবিতার প্রাচুর্য সম্ভব হয়েছিল। তার আগেও অনুবাদচর্চার ধারা প্রবাহিত ছিল; সত্যেন্দ্রনাথের পরেও এ ধারার গতি মন্দীভূত হয়নি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'প্রতিধ্বনি'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—'স্বরচিত কবিতায় ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের যে-স্থান, কবিতার অনুবাদে সে আসন আপাতত মূলের প্রাপ্য।' উপস্থিত 'বুলগেরিয়ার কবিতা' অনুবাদ-সংগ্রহে উনিশ শতকের মধ্যপর্ব থেকে বুলগেরিয়ার সাম্প্রতিক পর্ব অবধি বিভিন্ন কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। শ্রীযুক্ত অরুণ দাশগুপ্তের এই অনুবাদগুলি সবই বুলগেরিয় ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ। প্রধানত এগুলির মধ্য দিয়ে বুলগেরিয়ার নানা শক্তিমান কবির চিন্তাধারার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের যোগ ঘটবে। কালের পরিবর্তন, আদর্শের জয়গান, দুঃখের স্বীকৃতি, সংগ্রামের শপথ,—বলকান গিরিমালার প্রেক্ষাপটে বাজ আর শামুকের সংলাপ,—বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের গোলা-বারুদ-ছুরি-বুলেটের আবহাওয়া এইসব রচনার অন্তর্লীন। ব্যক্তিপ্রেম আর দেশপ্রেম এখানে পরস্পরের অন্তরঙ্গ। জেলখানার দেয়াল, আর নিজের বাড়িতে ভোর হবার নৈসর্গিক মাধুর্যের স্মৃতি খুবই সন্নিহিত এইসব রচনায় ইতস্তত। নিকোলা ভাপৎসারোভ (১৯০৯-৪২) তাঁর মৃত্যুর দু'ঘন্টা আগে লিখে গেছেন—

একঝাঁক বুলেট, তারপর কীটের খাবার
অত্যন্ত সহজ সরল এই পরিণাম।
হে দেশবাসী, তোমাদের ভালবাসি, তাই
ঝড়ের সাথে আমি আসবো আবার।

জেলখানার দেয়াল মনে বিঁধে আছে নিরন্তর। সেই বোধের চাপে ইভান পেইচেভ (১৯১৮ জন্ম) লিখেছেন—

এ দেয়ালের পিছে
নিস্তব্ধ আঁধার চুরি করে নিয়ে যায়
ভেজা-ভেজা ঘাসের মর্মর,
ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে,
রুটি নিয়ে কেউ আছে অপেক্ষায়।
রাত্রি হাঁপায়।
বিশাল আকাশ দোলে।

সিমেন্ট, পাথর, রক্ত, সন্ত্রাস এবং প্রেয়সীর চুম্বন, গমের ক্ষেত, ঘাসের মর্মর ইত্যাদি উপকরণ বুলগেরিয়ার সংগ্রামের যন্ত্রণাময় দিনগুলিতে কবিদের অনুভূতির উত্তাপে বিচ্ছেদহীন অন্বয়ের রূপায়ণ ঘটিয়েছে। এ অভিজ্ঞতা পরমাশ্চর্য।

হরপ্রসাদ মিত্র

* অনুবাদকের নিবেদন *

প্রায় বিশ বছর আগে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার অদূরে এক ছাত্র-শৈলাবাসে মে-দিবসের মনোরম সন্ধ্যায় প্রথম শুনেছিলাম ভাপৎসারোভের কবিতার আবৃত্তি। সেদিন বুলগেরিয় ভাষা ভালো জানা ছিল না, পুরোপুরি মানে বুঝতে পারিনি। তবু সেই কবিতার ধ্বনি, তার আবেদন পৌঁছেছিল হৃদয়গভীরে। ক্রমে ক্রমে বুলগেরিয় ভাষা কিছুটা আয়ত্ত হয়েছে, নিবিড় ও গভীর হয়েছে বুলগেরিয়ার সাহিত্যের সাথে, বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যের সাথে পরিচয়, আর মুগ্ধ হয়েছি। মুগ্ধ হয়েছি সাম্প্রতিক কবিতায় প্রকাশমান বুলগেরিয়দের প্রাণপ্রাচুর্য দেখে, মুগ্ধ হয়েছি কবিতার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট এঁদের সংগ্রামী চেতনা দেখে। মুগ্ধ হয়েছি বুলগেরিয়ার সংগ্রামী কবিদের রচনার সাথে পরিচিত হয়ে। শুধুমাত্র মহান কবিই ছিলেন না এঁরা, এঁদের মধ্যে অনেকেই মুক্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে সাম্প্রতিক কালের বুলগেরিয়ার কবিতার জন্ম গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিকায় সশস্ত্র সংগ্রামের আগুনে, কারণ এ দেশের সাহিত্য, বিশেষ ভাবে কাব্যসাহিত্য গত একশো বছরের ঘটনাবহুল ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি এবং বহু বছরের নিরলস সংগ্রামের ফলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য—এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুলগেরিয়ার কাব্য-সাহিত্যের গতি পর্যবেক্ষণ করা, তার রসাস্বাদন করা, যে কোন সাহিত্যরসিকের আগ্রহ জাগ্রত করবে, এই বিশ্বাসেই আমার পরিশ্রমের ডালি বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

সাহিত্যের অনুবাদ করা বেশ কঠিন, আর কবিতার অনুবাদ বোধ হয় আরো দুরূহ, বিশেষ করে যদি একজনকেই বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন মেজাজের কবিদের রচনা অনুবাদ করতে হয়। এই অপরিহার্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই কবিতার সংকলনটি পাঠককে বুলগেরিয়ার সাম্প্রতিক কালের

কবিতার সাথে গভীর না হলেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ দেবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। স্থানাভাবে প্রত্যেক কবি সম্পর্কে পৃথক ভাবে আলোচনা করা এ সংস্করণে সম্ভব হলো না। তবু সংক্ষিপ্ত ভাবে সাম্প্রতিক বুলগেরিয়ার কবিতার ধারা এবং গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে নীচের কয়েকটি লাইন লেখা হ'ল। আশাকরি এ উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

* * *

ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বলকান উপদ্বীপে পাহাড়ী দেশ এই বুলগেরিয়া। আয়তনে ছোট বলেই বোধ হয় প্রকৃতি তার স্নেহ উজাড় করে নানা সৌন্দর্যে সাজিয়েছে বুলগেরিয়াকে। ঘন অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ী ঢেউয়ে যতি টেনেছে শস্য-শ্যামল উপত্যকা আর প্রান্তর। উত্তরে দানিয়ুব নদীর স্নিগ্ধ জলধারা আর পূর্বে কৃষ্ণ সাগরের উর্মিমালা, পশ্চিমে ও দক্ষিণে দুর্গম পর্বতশ্রেণী যেন সযত্নে ঘিরে রেখেছে এই দেশটিকে। তবু পূর্ব আর পশ্চিম, ইউরোপ আর এশিয়ার সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে অনেক ঘটনাবহুল অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে বুলগেরিয়া—অনেক সভ্যতার- মিলনকেন্দ্র। এরই থ্রেসের প্রান্তরে জন্ম নিয়েছে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের অগণিত যোদ্ধা, প্রোথিত হয়েছে এখানে রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বজা, এসেছে বৈজেন্তীয় সাম্রাজ্যের শাসন, আর অবশেষে তুর্কী সাম্রাজ্যের পাঁচ শতাব্দীব্যাপী অন্ধ জোয়াল।

বুলগেরীয় রাষ্ট্রের স্থাপন হয় ৬৮১ খৃঃ অব্দে, তার প্রায় তিনশো বছর পরে জন্ম হয় বর্তমান বুলগেরীয় ভাষার। নবম শতাব্দীতে গ্রীক, লাতিন এবং হিব্রু এই ত্রি-ভাষার ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য, গীর্জার পুঁথি-পত্র, মন্ত্র-স্তোত্র, সবই লেখা হতো এরই কোনও একটি ভাষাতে, সাধারণ মানুষের কাছে, বিশেষ করে স্লাভগোষ্ঠীর মানুষের কাছে যা ছিল দুর্বোধ্য। এই সময় সুপণ্ডিত কিরিল ও তাঁর সুযোগ্য সহোদর মেতোদিউসের প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হলো বুলগেরীয় ভাষার। পুরোহিত প্রধানেরা সহজে মেনে নিলেন না এ-ভাষাকে। নূতন ভাষার প্রবক্তাদের সইতে হলো বহুবর্ষব্যাপী নির্যাতন। অবশেষে যখন এই নূতন ভাষার অনুগামীদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাবার পথে, বুলগেরিয়া আশ্রয় দিল তাদের, গ্রহণ করলো নূতন ভাষাকে নিজস্ব ভাষা হিসাবে। স্থাপিত হলো ভাষা-

চর্চার আশ্রম বা বিদ্যালয়। অল্প সময়ের মধ্যেই নূতন বুলগেরীয় ভাষায় অনুবাদ হলো প্রার্থনার পুঁথিপত্র, গ্রন্থ রচিত হলো নানা শাস্ত্রবিষয়ে সৃষ্টি হলো বুলগেরীয় ভাষার আদি সাহিত্য। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে নূতন ভাষা এবং সাহিত্যে বলীয়ান হয়ে বুলগেরিয়া উঠল সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে; এই কেন্দ্র থেকে নূতন ভাষা ছড়িয়ে পড়লো পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের স্লাভজাতি-অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশে—সৃষ্টি হলো রুশ, চেক, পোল ইত্যাদি ভাষার।

বুলগেরিয়ার এই সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ব্যাহত হলো অচিরেই। অন্তর্ঘাতী কলহে দুর্বল হলো বুলগেরীয় রাষ্ট্র। সেই সুযোগে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরাক্রমশালী তুর্কী সাম্রাজ্য গ্রাস করলো বুলগেরিয়াকে, পদানত করে রাখলো তাকে দীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে।

অনেক ব্যর্থ সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাসে পূর্ণ এই পাঁচ শতাব্দী। একটানা দুর্যোগ বয়ে চললো সারা দেশের উপর দিয়ে। সমগ্র বুলগেরিয়াকে, তার সংস্কৃতি এবং কৃষ্টিকে পূর্ণগ্রাস করবার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালালো তুর্কীরা। তবু, বিদেশী শাসকের পরাক্রমের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও আলেকজান্দার আর অরফিউসের বংশধরেরা আপন স্পর্ধায় মাথা উঁচু করে রইলো। দলে দলে বিদ্রোহী, বুলগেরীয়ার ইতিহাসে যারা 'হাইদুক' নামে পরিচিত, স্থান নিল বল্‌কান পর্বতশ্রেণীর ঘন অরণ্যে। চপলা পাহাড়ী ঝর্ণার কলতান তাদের কণ্ঠে দিল সুর, আদিগন্ত ঢেউখেলানো পাহাড়ের সারি তাদের সুরে দিল ছন্দের দোলা। সৃষ্টি হলো আনন্দ-বিষাদে ভরা অসংখ্য লোকগাথা। গীর্জার পুঁথিগত সাহিত্যের পর লোকগীতিতেই সাম্প্রতিক বুলগেরিয়ার কাব্যের স্ফুরণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সারা ইউরোপ জুড়ে গণজাগরণের ঢেউ এসে লাগলো বুলগেরিয়ার পরাধীন জনমানসে। নবজাগরণের ছোঁয়া লাগলো সাহিত্যে; পেতকো স্লাভেইকোভ ও ল্যুবেন কারাভেলোভের কবিতার ছন্দে জেগে উঠলো দেশপ্রেমের নূতন প্রেরণা। মুক্তিপাগল জনসাধারণ সহ্যের শেষ সীমায়—অধীর, অসহিষ্ণু। ছোটোখাটো বিক্ষোভ-বিদ্রোহ নির্মম অত্যাচারে দলিত-মথিত। এমনি অগ্নিগর্ভ সময়ে আবির্ভূত হলেন কবি খৃস্তো বোতেভ। তাঁর কবিমনের একটিই সঙ্কল্প—"স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু"—

এর মাঝামাঝি কিছু নেই, আপোসের ক্ষেত্র নেই। একদিকে সশস্ত্র সংগ্রামের দৃঢ়চিত্ত প্রস্তুতি অন্যদিকে কবিতায় তার উদাত্ত ঘোষণা!

"মুক্তি যুদ্ধে যে দিয়েছে প্রাণ
সে যে মৃত্যুহীন!…"

[হাজি দিমিত্‌র পৃঃ ১৩]

নির্ভীক কবিযোদ্ধা মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে নিজের জীবন বলি দিয়েছেন। তাঁর কবিতা আজো প্রতিটি বুলগেরিয়াবাসীর কাছে সংগ্রামের অমোঘ আহ্বান, প্রেরণার অফুরন্ত উৎস। খৃস্তো বোতেভ কেবলমাত্র দেশপ্রেমিক কবি ও যোদ্ধাই ছিলেন না, তাঁর লেখনীর ক্ষুরধারে ধনিক ও তাদের পদলেহীদের মুখোশ ছিন্নভিন্ন করেছেন, গেয়েছেন অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের জয়গান, স্বপ্ন দেখেছেন শোষণমুক্ত সমাজের। বুলগেরিয়ার শতবর্ষব্যাপী বাস্তবধর্মী কাব্য ও সাহিত্যের অগ্রদূতের স্থান বোতেভেরই প্রাপ্য।

খৃস্তো বোতেভের আত্মাহূতি ব্যর্থ হয়নি। তাঁর আত্মোৎসর্গের অব্যবহিত পরেই বুলগেরিয়া-জুড়ে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন। সন্ত্রস্ত তুর্কী শাসকেরা নির্বিচারে মানুষের রক্তের নদীতে ডুবিয়ে দিতে চাইলো বিদ্রোহ। সমগ্র ইউরোপে জেগে উঠলো প্রতিবাদের তীব্র ধিক্কার। অবশেষে রুশ-তুর্কী যুদ্ধের ফলে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে স্বাধীনতা পেলো বুলগেরিয়া।

বন্ধনমুক্ত জাতির বুকে জাগলো নবজাগরণের ঢেউ। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা গেল তার স্ফুরণ। অনেক লেখক এবং কবির আত্মপ্রকাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বুলগেরিয়ার সাহিত্যাকাশ, আর তার মাঝে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হয়ে দেখা দিলেন ইভান ভাজোভ।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বুলগেরিয়াতে তখন রেনেসাঁসের পত্তন হয়েছে। বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে সদ্যমুক্ত জাতি তখন চাইছে আত্মপ্রতিষ্ঠা, খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজের স্বাতন্ত্র্য। সেই যুগসন্ধিক্ষণে ইভান ভাজোভের কবিতা এবং গদ্যরচনা বুলগেরিয়ার সাহিত্যজগতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। খৃস্তো বোতেভ নূতন বুলগেরীয় সাহিত্যকে দিয়েছিলেন গতি, পথের নির্দেশ। সৃষ্টিশীল দীর্ঘজীবনের আশীষপ্রাপ্ত ইভান ভাজোভ তাঁর বিশাল রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ করলেন তাকে। দিলেন বিশ্বসাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠা।

রেনেসাঁস-পরবর্তী যুগের কবিরা বুলগেরিয়ার কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে জড়ো করতে লাগলেন নূতন নূতন সম্পদ। অবশ্যম্ভাবী রূপেই বিদেশী সাহিত্যের প্রচুর প্রভাব এ কালের রচনাতে স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত, বিশেষ ভাবে রুশ কবি প্পুশ্‌কিন, লারমেনতোভ ও ব্লকের রচনাভঙ্গীর প্রভাব অনেকের সৃষ্টিতেই বিদ্যমান। অবশ্য এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বুলগেরিয়া এবং রুশিয়ার জনসাধারণের সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য, ভাষার নৈকট্য এবং বুলগেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে রুশিয়ার প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ দুইদেশের মানুষকে বেঁধেছে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে, তাই অন্যান্য বিদেশী সাহিত্যের তুলনায় রুশ সাহিত্যের প্রভাবই বুলগেরিয়ার পদ্য এবং গদ্য সাহিত্যে সর্বাধিক।

স্বাধীনতা পেলেও বুলগেরিয়ার জীবনে শান্তি বা স্থিরপ্রগতির যুগ তখনও সুদূরপরাহত। বুলগেরিয়ার ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চল তুর্কীকবল-মুক্ত করবার সংগ্রাম তখনও চলছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ম্যাসিডোনিয়া মুক্ত হলো, কিন্তু তার পরেই ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পড়শী রাজ্যগুলির সাথে যুদ্ধে বুলগেরিয়াকে স্বীকার করতে হলো পরাজয়ের গ্লানি। তার দু বছর পরেই এলো সর্বগ্রাসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বুলগেরিয়ার শাসকগোষ্ঠী জার্মানীর পক্ষ নেওয়াতে বুল-গেরিয়া আবার হলো পরাজিত দেশ। খেসারত হিসাবে আরও সঙ্কুচিত হলো দেশের পরিসীমা। পরিণামে জনজীবনে এলো তুমুল আলোড়ন, স্বভাবতঃই প্রভাবিত হলো সাহিত্যসৃষ্টি।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইভান ভাজোভ ছাড়া অন্যান্য যে সব কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পেন্‌চো স্লাভেইকোভ, পেয়্যু ইয়াভোরভ, তেয়োদোর ত্রায়ানোভ, নিকোলাই লিলিয়েভ, হ্রস্তো ইয়াসেনোভ ও দিমচো দেবেলিয়ানোভ।

'শুধুমাত্র জীবনধারণ করছি না আমি, আমি জ্বলছি'—পেয়্যু ইয়াভোরো-ভের এই উক্তি তাঁর আবেগ-উদ্দীপ্ত হৃদয়ের, তাঁর অশান্ত জীবনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী পেয়্যু ইয়াভোরভের রচনা পূর্ব-সূরীদের ক্লাসিকাল ভঙ্গীকে ভেঙ্গেচূরে নূতন পথের সন্ধান দেয়। ম্যাসি-ডোনিয়ার মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সুরু হয় ইয়াভো-রভের কাব্যজীবন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা, আশা-নিরাশা তাঁর রচনার মূল বিষয়বস্তু, কিন্তু তাঁর প্রতিভার সোনার কাঠির

স্পর্শে রূপ পেয়েছে তা দরদী মনের ছন্দিত প্রকাশে। লিরিক্যাল কবিতার ক্ষেত্রে বুলগেরিয়ার সাহিত্যে পেয়ু ইয়াভোরভের দান স্বীয় মাধুর্যে অদ্বিতীয়।

ইয়াভোরভের উত্তরসূরীরা স্বভাবতঃই তাঁর মতো সমুজ্জ্বল প্রতিভার প্রভাববিমুক্ত হতে পারেন নি, তবুও তাঁরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছেন বুলগেরিয়ার কাব্যসাহিত্যে। প্রাক্-প্রথম-বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের জনজীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। তেয়োদোর ত্রায়ানোভ, নিকোলাই লিলিয়েভ, খৃস্তো ইয়াসেনোভ অল্পবিস্তর এই দিশাহারা কালেরই প্রতিভূ। মূল সুর থেকে বিচ্যুত হলেও এঁদের সৃষ্টি—ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে বুলগেরিয়ার সামগ্রিক সাহিত্যকে সুনিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দিমৃচো দেবেলিয়ানোভ। এই প্রতিভাবান কবির যুদ্ধক্ষেত্রে তারুণ্যে জীবনাবসান যেন বুলগেরিয়ার তরুণ প্রতিভাবান কবিদের অমোঘ নিয়তিরই পুনরাবৃত্তি। মিঠে সুরে বাঁধা তাঁর কবিতাগুলি যৌবনের সুষমা-মণ্ডিত চঞ্চল হৃদয়ের রক্তিম স্বাক্ষর।

প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের আগেই বিশ্বজুড়ে নেমে আসে পরিবর্তনের জোয়ার। রুশ বিপ্লবের দামামানির্ঘোষ সারা দুনিয়ার বঞ্চিত মানুষের প্রাণে জাগিয়ে তোলে শতাব্দীব্যাপী শোষণের জগদ্দল পাথরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা। বুলগেরিয়াতেও রুশ বিপ্লবের অমোঘ প্রভাব জনচেতনার সামনে তুলে ধরে উজ্জ্বল আশার প্রদীপ। এ যুগের কবিরাও তাই ভাববিলাসের গোলকধাঁধাঁ ত্যাগ করে নেমে আসতে বাধ্য হন পথে,—নিপীড়িত, অত্যাচারিত জনসাধারণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন আশার গান, নূতন জীবন গড়ার গান, বিপ্লবের গান। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অশান্ত ও দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগে আত্মপ্রকাশ করেন বুলগেরিয়ার তিনজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কবি ঃ হৃস্তো স্মিরণেন্স্কি গেও মিলেভ ও নিকোলা ভাপৎসারোভ।

বিপ্লবী ঝোড়ো হাওয়ার আবহাওয়ায় উল্কার তেজে আবির্ভূত হৃস্তো স্মিরণেন্স্কি শোনালেন দেশে ও বিদেশে বঞ্চিত মানুষের জয়যাত্রার গান লাল ঘোড়সওয়ারের দল সব বাধা তুচ্ছ করে ছুটে চলেছে বিজয় অভিযানে ঃ

"পবন-গতি চলো সওয়ার দল, তোমাদেরই চলার গতিপথে
রঙ্গীন আশার প্রদীপ জেলে বুকে লক্ষ মানুষ চোখ ফিরিয়ে আছে।

বদ্ধমুষ্টি তুলে আকাশপানে সারা জগৎ জানায় আশীর্বাদ,
লক্ষ মনে জাগে শিহরণ শুনে তোমার বিজয় তূর্যনাদ।

[লাল ঘোড়সওয়ার ঃ পৃঃ ৬৫]

অন্যায় শোষণের শিকার শ্রমজীবী মানুষের রক্ত-জল-করা শ্রমের মূল্যে তৈরি আধুনিক সভ্যতার প্রতিভূ লাস্যময়ী নগরীর মুখোশ ছিন্নভিন্ন করলেন স্মিরণেন্‌স্কি। বুলগেরিয়ার কাব্যসাহিত্যে স্মিরণেন্‌স্কিই প্রথম সর্বহারাদের কবি। তাঁর শিল্পরসোত্তীর্ণ রচনায় নিরাশার কোনো স্থান নেই, স্থান নেই কোনো দ্ব্যর্থকতার, নিশ্চিভাবেই তিনি স্থান করে নিয়েছেন সংগ্রামী মানুষের পাশে এবং বুলগেরিয়ার সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ে।

১৯২৩ সাল। দেশের গনতান্ত্রিক শক্তিগুলির দ্রুত অগ্রগতিতে সন্ত্রস্ত ফ্যাসিস্ত চক্র সামরিক বাহিনীর সাথে যোগ-সাজসে ক্ষমতা দখল করলো বুলগেরিয়াতে। প্রগতিশীল শক্তিগুলি চরম দমননীতির সম্মুখীন হলো। জনতা তার প্রত্যুত্তর দিল সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানে। সংগঠিত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে পরাজিত হলো অভ্যুত্থানকারীরা। বলি হলো অগুন্তি প্রাণ, জনশূন্য হলো অসংখ্য জনপদ। নিস্পেষণের রথের চাকায় পিষ্ট হলো সাধারণ মানুষ, স্তব্ধ হলো বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠস্বর। কিন্তু তবু গণসংগ্রামের এই রক্তরাঙ্গা দিনগুলিকে অমর করে রেখেছেন গেও মিলেভ তাঁর অবিস্মরণীয় কবিতা 'সেপ্টেম্বর'-এ। ফ্যাসিস্ত জহ্লাদের হাতে প্রাণ দিয়ে গেও মিলেভকে পূর্ণ মূল্য দিতে হয়েছে তাঁর গনঅভ্যুথানের আলেখ্যচিত্রণের অসমসাহসিকতায়। খেটে-খাওয়া মানুষের বিপ্লবী জাগরণের 'সেপ্টেম্বর'-এর বর্ণনা বিশ্বসাহিত্যের এক অপরূপ সৃষ্টি। দিব্যদ্রষ্টার মতো গেও মিলেভ সুদূর প্রসারিত দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের যে ছবি এঁকেছেন 'সেপ্টেম্বরের' শেষ ক'টি ছত্রে, তা শুধু সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবির পক্ষেই সম্ভব!

"ঈশ্বর নিপাত যাক্!
আকাশের অন্তহীন সেতু বেয়ে
বেঁধে দড়াদড়ি
টেনে আনবো নীচে
বিশাল পৃথিবীর বুকে
স্বর্গপুরী।

যত কিছু লিখে গেছে কবি দার্শনিক
সব সত্য হবে।
—চাই না ঈশ্বর, শাসকের নেই প্রয়োজন।…
সেপ্টেম্বর হবে পরিণত বসন্তের মাসে।
মানব জীবন
অগ্রসর হবে এক চিরন্তন প্রগতির পথে
—উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে, সমৃদ্ধির রথে।
এ পৃথিবী হবে স্বর্গপুরী—
হবেই! ["সেপ্টেম্বর" ঃ পৃঃ ১০৬]

গেও মিলেভের 'সেপ্টেম্বর'-এর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল বিশ বছর পরে ১৯৪৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে। ফ্যাসিস্ত শাসনের কবলে এই বিশ বছর বুলগেরিয়ার সাহিত্যজীবন কেটেছে শ্বাসরোধকারী অসহ আবহাওয়ায়। নিষ্ঠুর শাসনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জনতা সংগ্রামমুখীন। নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে ললিত সুরে গানের দিনের অবসান হয়েছে। দেশে এক অগ্নিগর্ভ স্তব্ধতা, প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাষ।

সুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। বুলগেরিয়ার শাসকগোষ্ঠী আবার অক্ষশক্তির পক্ষে। দেশের প্রগতিশীল দলগুলি একজোট হয়ে অবতীর্ণ হলো সশস্ত্র সংগ্রামে, আর অস্ত্রের ঝনঝনাকে ছাপিয়ে, কয়েক বছরের নিস্তব্ধতাকে খান্‌-খান্‌ করে—ধ্বনিত হলো বিপ্লবী কবি ভাপৎসারোভের কণ্ঠস্বর, আগতপ্রায় সুদিনের প্রতি তাঁর ইস্পাত-দৃঢ় বিশ্বাস ঃ

কি ক'রে চূর্ণ হবে আমার বিশ্বাস?
বুলেটে ওড়াবে?
অর্থহীন
বৃথাই খরচ হবে গুলি!
হৃদয়ের অন্তঃস্তলে
অভেদ্য বর্মে ঢাকা বিশ্বাস আমার,
এ বর্মভেদী বুলেট

এখনো তৈরী হয়নি,
তৈরী হয়নি আজো !

ভাপৎসারোভ ছিলেন বিপ্লব আর নূতন জীবনের স্বপ্নে রোমাঞ্চিত কবি। জীবনকে তিনি ভালোবেসেছেন পরিপূর্ণভাবে আর তাই পৃথিবীকে পরগাছা-মুক্ত করবার সংগ্রামে মৃত্যুও তাঁর কাছে মহাসঙ্গীত ঃ

কিন্তু এ মৃত্যু,
যখন পৃথিবী
ঝেড়ে ফেলেছে
তার বিষাক্ত
পরগাছা,
যখন পুনর্জীবিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ,
এ মৃত্যু-সঙ্গীত তখন,
সত্যই গান।

সশস্ত্র সংগ্রামের সক্রিয় কর্মী হিসাবে বন্দী হয়ে জহ্লাদের বুলেটে প্রাণ দেন নিকোলা ভাপৎসারোভ। কিন্তু অটুট বিশ্বাসে অবিচল ভাপৎসারোভ। মৃত্যুর দু'ঘন্টা পূর্বেও তিনি জানিয়ে গেছেন দেশবাসীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা ঃ

একঝাঁক বুলেট, তারপর কীটের খাবাব,
অত্যন্ত সহজ সরল এই পরিণাম।
হে দেশবাসী, তোমাদের ভালোবাসি, তাই
ঝড়ের সাথে আমি আসবো আবার।
['যাবার আগে' ঃ পৃঃ ১৬৮]

বোতেভ, স্মিরণেন্স্কি, ভাপৎসারোভ এবং অন্যান্য অনেক কবি ও লেখকের স্বপ্ন সফল হলো। এলো সেই গেও মিলেভের 'সেপ্টেম্বর'। সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় হলো বুলগেরিয়াতে। সুরু হলো নূতন সমাজ, নূতন দেশ, নূতন মানুষ গড়ার পালা। বিপ্লবোত্তর যুগে সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশ ঘটতে লাগলো বুলগেরিয়াতে। নিরক্ষরতা দূর হলো অচিরেই। সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হলেন বহু নূতন লেখক এবং কবি কিন্তু শিল্পোত্তীর্ণ

ও রসোত্তীর্ণ কবিতার সৃষ্টি সহজ হলো না। নূতন অবস্থায় শোষক শ্রেণী বিলুপ্ত, তার সাথে প্রত্যক্ষসংগ্রামের প্রশ্ন নেই, তাই নূতন বীণার তারে সুর বাঁধতে কিছুটা সময় লেগেছে বৈকি। এরই মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছেন তীব্র-দাহন তরুণ কবি পেনিও পেনেভ। সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের বিশাল কর্মকাণ্ডে সাধারণ শ্রমিক হিসাবে অংশগ্রহণ করে পেনিও পেনেভ গেয়েছেন নূতন সুরের সর্বপ্রথম গান ঃ

স্বপ্ন দেখিনা আমি
অমর হবার
কিম্বা পুষ্পাকীর্ণ পথ।
বস্ত্র শুধু চাই দেহে
শীতে-জমা দিনে।—
মৃত্যুহীন
হয়ে থাক
সহস্র সম্বৎ
গড়েছি
যা কিছু আমি
নিজে এইখানে।

[আমি জনতার একজন]

এ সময়ের অন্যতম কবি ভেসেলিন হানচেভ. দীর্ঘ রোগভোগে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

বেঁচে আছি।
আমার ভিতরে সবকিছু
প্রচণ্ড উত্তাপে শ্বেতপ্রভ।
বেঁচে আছি।

['বেঁচে আছি' ঃ পৃঃ ১৭৬]

সমসাময়িক কালের কবিরা সার্থক ভাবেই বোতেভ স্মিরণেন্স্কি ভাপৎসারোভের ধারা বহন করে চলেছেন। অনেকেই তাঁদের দৃপ্ত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বর্তমান যুগের বুলগেরিয়ার কবিতায়। এঁদের মধ্যে যাঁরা

সর্বাগ্রগণ্য তাঁরা হলেন আন্দ্রেই গেরমানোভ, দামিয়ান দামিয়ানোভ, পেতার কারাঙ্গোভ, ল্যুবোমির লেভচেভ এবং ভ্লাদিমির বাশেভ।

* * * *

বুলগেরিয়ার মহিলা কবিদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বললে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অশীতিপর ডোরা গাবে, সপ্ততিপর এলিজাভেতা বাগ্রিয়ানা তাঁদের রচনায় আজো পূর্ণযৌবনা। জীবনের আশিটি বছর অতিক্রম করেও ডোরা গাবে অনমনীয়া। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলছেন :

একটু দাঁড়াও, সূর্য।
আমি যে প্রস্তুত নই
আগামী রাত্রির জন্য,
আমার দিন যে শেষ হয়নি এখনো।
চেতনার সাথে বোঝাপড়া এখনো যে বাকী
বিশ্রামের অবকাশ কোথায় এখন ?
["একটু দাঁড়াও, সূর্য" : পৃঃ ৭৪]

অনাবিল দেশপ্রেম এবং গভীর মানবিক আবেদনে ভরা বাগ্রিয়ানার কবিতা বুলগেরিয়ার কাব্যসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অন্যান্য প্রতিভাশালিনী মহিলা কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্লাগা দিমিত্রোভা, নেভেনা স্তেফানোভা, লিলিয়ানা স্তেফানোভা ও স্তান্‌কা পেন্‌চেভা।

* * * *

এর পূর্বে বুলগেরিয়ার দু'জন কবির রচনাসংকলন বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে—"দিন আসবে" (ভাপৎসারোভ) এবং গীতিকা (ভেসেলিন হানচেভ)। মূল ভাষা থেকে অনূদিত এই সংকলনে গত একশো বছরে বুলগেরিয়ার কবিতার ক্রমবিকাশের মূল ধারাকে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। খ্যাত এবং অখ্যাত অনেক কবিই এ সংকলনের বাইরে থেকে গেছেন। তবু বিভিন্ন ধারার প্রতিনিধিমূলক রচনা এতে সংযোজিত হয়েছে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যদি বুলগেরিয়ার কবিতার একটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে পেরে থাকি তবেই আমার প্রচেষ্টার সার্থকতা।

সংকলনটি প্রকাশের ব্যাপারে অনেকের কাছেই আমি ঋণী। তবু স্ত্রী সুনন্দার উৎসাহ, বন্ধু দিলীপের সাহায্য এবং প্রকাশক গৌরীশঙ্করবাবুর সহযোগিতার ঋণ অপরিশোধ্য।

নিউ দিল্লী
১লা জানুয়ারী, ১৯৭১

অরুণ দাশগুপ্ত

বুলগেরিয়ার কবিতা

পেতকো স্লাভেইকোভ ॥ ১৮২৭-১৮৯৫ ॥

খেয়ালী কাল চলেছে বয়ে

খেয়ালী কাল চলেছে বয়ে
আমাদের সময় হ'লো শেষ...
তরুণ দলের এবার শুরু পালা
আশার আলোর ঐ দেখা যায় রেশ।
সমুখ পানে এগিয়ে যাবার ডাকে
যাক্ না ওরা পথের বাধা ঠেলে...
ক্লান্ত যারা ঢলে ঘুমের কোলে ;
সবুজ যাদের প্রাণ যেন তারাই বেঁচে থাকে।

এই জগতে অতিথি মুহূর্তের—
লজ্জা হানুক তাদের যারা ভাবে,
গরিমাময়। অস্ত্র হাতে যারা
নিজের স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে রবে।
বুড়োরা যদি থামে পথের বাঁকে
পথের দিশা দেবে যুবা দলে...
ক্লান্ত যারা ঘুমের কোলে ঢলে ;
সবুজ যাদের প্রাণ যেন তারাই বেঁচে থাকে

চাষের জমি তৈরী এখন শোনো
বীজ বপনের সময় হ'লো, সূর্য আগুন-জ্বালা,
সত্যের বীজ ছড়াও এবার না শুনে কোনো মানা,
সময় হলেই ছড়াবে ডালপালা।
নতুন দিন বলছে যেন হেঁকে
তৈরী থেকো যাবার পালা এলে…
ক্লান্ত যারা ঘুমের কোলে ঢলে ;
সবুজ যাদের প্রাণ যেন তারাই বেঁচে থাকে।

জনতার একজন

পাপ বলে ভেবেছি অন্য সব কিছু
আদর্শকে দিয়েছি উচ্চতম স্থান,
পৃথিবীর রূপ রস তুচ্ছ ক'রে সব
আদর্শের কাছে মোর আত্মসমর্পণ।

প্রয়োজন এরই আছে—প্রবোধ দিয়েছি
অপরের উপকার, চিন্তা শুধু তাই—
আগে সবাকার হোক, পথ ছেড়ে দাও,
নিজ কাজ পরে হবে, কোনো খেদ নাই।

অনেক, অনেক ব্যথার ভারবাহী হ'য়ে—
জীবন সায়াহ্ন এলো—জনপ্রিয় লোক...
ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, নগ্নপদ, নগ্ন মোর দেহ—
তখন সুস্পষ্ট হ'ল আমি জনতারই এক।

উপসংহার

উপলব্ধি করি আর স্পষ্ট দেখি আমি
তারুণ্যের সাথে রণে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ,
উজ্জ্বল দিনের আলো দিগন্ত সীমায়
অন্তিম মুহূর্ত আর রহিবে না থামি।

অতীতের স্মৃতি সব এখনো সজাগ
চিন্তার আকাশ যেন ছেয়ে ঢেকে থাকে—
স্বপ্ন দেখি ঈর্ষা-রং বসন্ত দিনের
তপ্ত রৌদ্রের দাহে যেন রক্তরাগ।

পৃথিবী দুর্বহ বোঝা, বোঝা আমি
জগতের কাছে, প্রয়োজনহীন…
নিঃশেষিত আজ অকর্মণ্য, বাক্যহীন
শব্দের নক্সায় আঁকা পথপ্রান্তে ভ্রমি।

ল্যুবেন কারাভেলোভ ॥ ১৮৩৪-১৮৭৯ ॥

সুন্দর তুমি অরণ্য আমার

সুন্দর তুমি অরণ্য আমার
তারুণ্যের সুবাসমণ্ডিত,
সমস্ত হৃদয় জুড়ে তবু
দুঃসহ বেদনা স্পন্দিত।

যে তোমাকে দেখেছে একদা
সারা জীবনের তার অপূরণ আশ,
তোমার নিবিড় ছায়ে ব'সে
দেহে পাবে সঞ্জীবনী শ্বাস।

কারো যদি হয় প্রয়োজন
চলে যেতে তোমা হতে দূরে
যতদিন দেহে তার রহিবে পরাণ
হেন সাধ্য নাই তার তোমায় বিস্মরে।

সুন্দর, সুন্দর তুমি অরণ্য আমার
তারুণ্যের সুবাসমণ্ডিত,
সমস্ত হৃদয় জুড়ে তবু
দুঃসহ বেদনা স্পন্দিত।

তোমার তমালশ্রেণী বিপুল বিশাল
পাতায় পাতায় ঢাকা ঘন আচ্ছাদন,
সুন্দর সুমিষ্ট তব ফুল, ফল, জল
সুপুষ্ট, নধর তব ছাগশিশুগণ।

তোমার বিচিত্র ফুল, শ্যাম দূর্বাদল
নিবিড় শীতল তব ছায়,
এ সকলি তবুও কখনো
শরের আঘাত হানে হায়।

হৃদয়ে আমার, এ হৃদয়
বেদনায় প্রস্তুত সর্বদা
ভাসিতে ক্রন্দনে, যখন সমুখে
প্রকৃতির বুকে জাগে নতুন বারতা।

বসন্তের নব পত্রপুট
বার্ধক্যেরে বিদায় জানায়
শৈত্য আবরিত তুষারের নীচে
নব প্রাণ ভরে ওঠে কানায় কানায়।

খ্রিস্তো বোতেভ ॥ ১৮৪৮-১৮৭৬ ॥

আমার প্রার্থনা

হে ঈশ্বর, হে আমার ভগবান!
নও তুমি মহাকাশে যার অবস্থান,
ডাকি তাকে যে আমার অন্তরে বিরাজে
আমার হৃদয় মাঝে দেবতা মহান...

নও তুমি, যার কাছে নত ক'রে শির
ভিক্ষা মাগে পুরোহিত, সেবক সেবিকা,
যার লাগি আরতির ধূপধূনা জ্বালে
পশুপাল একদল মহাভক্তিভরে;

নও তুমি, সৃষ্টিকর্তা যিনি
একতাল মাটি থেকে নর-নারী প্রাণ
মানুষেরে যে রেখেছে যুগ যুগ ধরে
এ মাটির দাস ক'রে পরায়ে শৃঙ্খল;

নও তুমি, যার শুধু বিগলিত প্রাণ
পুরোহিত, মহারাজ, কুলপতি তরে
অধীনতা-পাশে বদ্ধ রেখেছো যাদের
অন্নহীন, বস্ত্রহীন মোর সহোদরে;

নও তুমি, দাসদের যে শেখাও অবিরত
সহ্যশক্তি, প্রার্থনাতে সবকিছু ফলে
শূন্যগর্ভ স্তোকবাক্যে ভুলায়েছো তারে
জীবনের শুরু থেকে সমাপ্তিরও কালে;

নও তুমি, দেবতা যে মিথ্যাভাষণের
তুমি নও, নির্বোধের একমাত্র প্রভু,
আছে যত অসাধু আর হিংস্র অত্যাচারী,
মানুষের শত্রু যারা তাদের প্রতিভূ।

তোমাকে আহ্বান করি, দেব বিবেকের
দাসদের সারিতেই যে নেবে নিজ স্থান ;
সে দিন অদূরে নয় যেদিন সবার
কণ্ঠে ধ্বনিত হবে উৎসবের গান।

হে দেব, প্রেরণা দাও প্রত্যেক বুকে
স্বাধীনতা প্রেমে সবে করো বলীয়ান,
জনতার শত্রু সাথে আজ মোকাবিলা—
প্রত্যেকে যেন যোঝে জীবন কোরবান।

আমার বাহুতে তুমি শক্তি দাও আরো
এ দাসকুলে যদি জাগে বিদ্রোহ-বিনাশ
স্থান যেন নিতে পারি সেই মুক্তি-রণে,
সেই যুদ্ধে ফেলি যেন অন্তিম নিঃশ্বাস,

আমার অশান্ত হৃদয় বিদেশ মাটিতে
স্পন্দন হারায় না যেন,
আমার কণ্ঠস্বরের বিলোপ না ঘটে যেন
মরুভূমি বুকে কোনো...

বিষণ্ণ, বিষণ্ণ আমি

বিষণ্ণ, বিষণ্ণ আমি সুরাপাত্র দাও
বিস্মৃত হতে চাই স্খলনে আমার,
তোমাদেরি মত, নির্বোধের দল, অজ্ঞ যারা
অপমানে, গরিমা যাদের কাছে নহে পরিচিত।

বিস্মরণে ডুবে যাক মাতৃভূমি মোর,
প্রিয় গৃহখানি মোর, আমার শৈশব,
মুক্তি যুদ্ধে যারা প্রাণ দিল বলিদান
তাদের অমোঘ বাণী সংঘর্ষের ডাক!

ভুলে যাবো স্বজনেরে, ভুলে যাবো জাতি,
পিতার সমাধিস্থল, মায়ের বিলাপ
রাজসিক ভাবে যারা চৌর্যবৃত্তি করে
লুঠ করে আমাদের পোড়া বাসি রুটি।

বিত্তবান মানুষেরা উচ্চশ্রেণী গত,
লালসায় লোভাতুর-ব্যবসায়ী যত,
আরো আছে, পুরোহিত মন্ত্রের আড়ালে
পিষ্ট করে ক্ষুধাতুরে আর অসহায়ে।

লুঠ করো জনতাকে অবোধের দল
কে তোমাকে বাধা দেবে সুরাপাত্র হাতে?
প্রস্তুতিতে যে প্রয়োজন সময় অনেক
আমরা তো আজ শুধু মদ্যপের দল।

সুরাসিক্ত কণ্ঠে গেয়ে বীররস গান
বীরদর্পে শত্রুকুলে করি মুণ্ডপাত।
পানশালায় নাহি হয় স্থান সঙ্কুলান
পাহাড় পর্বত হবে মোদের আশ্রয়।

যেমনি ক্ষান্ত মোরা হই সুরাপানে
প্রতিজ্ঞাও লুপ্ত হয় বিস্মৃতির তলে।
অপরের আত্মদানে মূক থাকি মোরা
অথবা ছোটাই সবে হাসির ফোয়ারা।

ঘৃণ্য অত্যাচারী আরো প্রবল বিক্রমে
ধর্ষণ, লুণ্ঠন করে জন্মভূমি মোর
হত্যা আর রক্তের বাণিজ্য অবাধ
কর ধার্য করে যত অবনত শিরে।

ভরে দাও সুরাপাত্র কানায় কানায়
ডুবে যাক এ মর্মজ্বালা আসবের স্রোতে
সকল সুবুদ্ধি যবে হবে নিঃশেষিত
এ কঠিন হাত হবে কোমল পেলব।

সুরা চাই, আরো সুরা শত্রুরে ঘৃণিতে
ঘৃণা করি তোমাদের, দেশপ্রেমী যারা
অবশিষ্ট নাই কিছু করিবারে শোক,
তোমাদের চিনি আমি—তোমরা নির্বোধ!

সংগ্রাম

যৌবন বহে যায় দুঃখ পারাবার
ধমনীতে ক্রুদ্ধ রক্তের তরঙ্গ উত্তাল,
দৃষ্টি অসংবৃত, বুদ্ধি লোপ পায় বারংবার
সম্মুখে আসে বুঝি অশুভ বিশাল···
হৃদয় ভরিয়া আছে অতীতের স্মৃতি
বিষ-জ্বালা ভরপুর কানায় কানায়
প্রেম নাহি বুকে, আস্থা কারো প্রতি,
কে পারে জাগাতে বলো তাহাদের, হায়
নিঃসাড় নিদ্রায় যারা আজো অচেতন।
ভাবে সবে বিকৃতমস্তিষ্ক যারা সচেতন।
নির্বোধ সবারে করে সম্মানভূষিত ঃ
"ধনী বটে" বলে সে ; করে না জিজ্ঞাসা
কতজনে দগ্ধ ক'রে হয়েছে সে প্রীত
কতশত নিঃস্বের কেড়েছে সে আশা,
ঈশ্বরের বেদীর সম্মুখে মিথ্যা মন্ত্রজালে
সর্বনাশ করেছে কতো অবোধের দলে।
এমনি নির্দয় জীব সমাজের মাথা,
গীর্জা-পুরোহিত তার সেবায় প্রস্তুত ;
অশিক্ষিত শিক্ষক গায় তার গাথা
সাংবাদিক শুধু বোঝে তার যুক্তির অদ্ভুত,
সকল জ্ঞানের উৎস নাকি ভগবান-ভীতি···
ছাগচর্মে আবরিত নেকড়ের প্রীতি···
এই ভাবে কথা বলে' প্রচেষ্টায় থাকে
পৃথিবীকে ঢেকে দিতে মিথ্যার জালে
মানুষের সুবুদ্ধিকে খর্ব করে রাখে।
অত্যাচারী সলোমন, সেও নাকি কালে
স্বর্গের কোমল ক্রোড়ে হয়েছে প্রেরিত
ইন্দ্রের-সভায় তার মিলিয়াছে স্থান—

নির্বোধ, নির্বোধ অতি উক্তি তার যতো
ধরণীর লোক হায়, আজো করে চর্বিত চর্বণ—
"ভগবানে ভয় করো, রাজাকে সম্মান !"
মিথ্যা কথা ! অগণিত শতাব্দী পর্বত-প্রমাণ
সংখ্যাতীত বীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে
সংগ্রামে রয়েছে রত ইহাদেরি সাথে ধ্যানে, জাগরণে
মৃত্যুর শীতল স্পর্শ হীন, তুচ্ছ ক'রে।
কিন্তু হায়, সার্থক হ'লো কি তারা আত্মবলিদানে ?
অভ্যস্ত ধারায় বহে এ ধরার দিন
অত্যাচার, বর্বরতা আজো চলে বাধাবন্ধহীন ;
শক্তিমান লৌহহস্ত চুম্বনের মর্যাদা প্রখর
মিথ্যা বাণী শোনে লোকে বিশ্বাসে অটল,
নিঃশব্দে প্রার্থনা করে যবে প্রহারে জর্জর
চর্ম উৎপাটন করে দিয়ে বন্য পশুদল
গাত্রে সর্প ছেড়ে তার রক্তের বেসাতি—
তখনো ঈশ্বরের কাছে করিও মিনতি ঃ
"দয়া করো ভগবান, আমি ঘৃণ্য পাপী"—
প্রার্থনায় রত থাকো, থাকো তব বিশ্বাসে অটল,
ভগবান ক্ষমাশীল, ক্ষমে পাপী-তাপী।
আবর্তিত হয় ধরা, মিথ্যা আর দাসত্ব প্রবল
নিষ্ফলা পৃথিবীর বুকে আজো রাজত্বে আসীন।
পুরুষ-পুরুষ ধরে শুধে যাও ঋণ
রাত্রি-দিন—এইখানে, অন্তহীন, প্রভেদবিহীন।
তবু এই রক্তক্ষয়ী দাসত্ব রাজত্বে
অশ্রুজল—অত্যাচারে ভিত যার লীন
বর্বর উল্লাসে ঘেরা পাশব প্রভুত্বে
সংগ্রামের ডাক আসে, দৃঢ় পদে সমুখের পানে
হও অগ্রসর, পুণ্যার্জন করো আত্মবলিদানে,
বিঘোষিত করো দিকে দিকে, মাথা নহে হেঁট—
"খাদ্য দাও অথবা বুলেট।"

হাজি ডিমিত্‌র

বেঁচে আছে সে, বেঁচে আছে পর্বত কন্দরে,
রক্তাপ্লুত দেহ তার, অন্তিম শয্যায়
যোদ্ধা একজন, বক্ষে তার ক্ষত সুগভীর,
তরুণ সে যোদ্ধা একজন, পৌরুষ মজ্জায়।

একদিকে ধরাশায়ী বন্দুক তাহার,
অন্যদিকে তরবারি ভগ্ন, দ্বিখণ্ডিত,
আঁধার ঘনায় চোখে, হেলে পড়ে শির
ওষ্ঠে তার অভিশাপ বিশ্বের প্রতি।

সেথায় শায়িত যোদ্ধা, নভঃস্থল হ'তে
রুদ্ধগতি সূর্য হানে ক্রুদ্ধ অগ্নিবাণ,
দূর হ'তে ভেসে আসে কৃষকের গান,
দ্রুতগতি হয় আরো রক্তের ক্ষরণ।

ফসলের দিন···সঙ্গীত মুখর হও শৃঙ্খলিত চাষী,
গান গাও বেদনার! সূর্য তুমি দাবদাহ দাও সাথে তার
ক্রীতদাসে ভরা এ দেশের বুকে! হবে বলি
আরেকটি তরুণ প্রাণ···কিন্তু স্তব্ধ হও হৃদয় আমার!

মুক্তিযুদ্ধে যে দিয়েছে প্রাণ
সে যে মৃত্যুহীন! চরাচর শোকে মুহ্যমান,
গাছপালা, বন্যপশু, ধরণী গগন;
দেবদূত তার লাগি গেয়ে যায় গান।

সারাদিন শঙ্খচিল ছায়া দেয় তায়,
শ্বাপদ লেহন করে ক্ষত তার রাত্রে স্নেহভরে,
ঊর্ধ্বে ওড়ে বীর-সখা বাজ পাখী তার প্রহরায়
সম্মানিত করে যেন নিজ সহোদরে।

সন্ধ্যা নামে, আকাশেতে চন্দ্রের প্রকাশ,
নক্ষত্রের ঝিকিমিকি অসীম গগনে,
মর্মরিত বনরাজি, অধীর বাতাস,
পর্বত ধ্বনিত হয় বিদ্রোহের গানে।

বনবাসী পরীদল শুভ্র আচ্ছাদনে
কোমল ঘাসের 'পরে ধীর পদক্ষেপে
যোগ দেয় অপরূপ সঙ্গীতের তানে
নতজানু হয় এসে যোদ্ধার সমীপে।

একজন সিঞ্চিত করে মুখটি তাহার
অন্যজনে ক্ষতে তার ঔষধি লাগায়
যেমনি সে চোখ মেলে উপরে তাকায়
তৃতীয়া স্মিতহাস ওষ্ঠাধর চুম্বনে ভরায়।

বল মোরে, ভগ্নী মোর, কোথায় কারাজা[১] ?
কোথায় আমার সাথী যোদ্ধবৃন্দ দল,
বল মোরে, তারপর দেহ হ'তে নাও প্রাণ তাজা,
ভগ্নী মোর, পরপারে যেতে মন এখন আকুল।

হাততালি দেয় তারা, হাতে হাত ধরে
সঙ্গীতের তালে তালে ধায় চরাচর,
গান গেয়ে নিশিভোর খুঁজে খুঁজে ফেরে
স্বর্গে-মর্ত্যে কোণে কোণে আত্মা কারাজার।

ঊষাগম দিগন্তে আবার পর্বত কন্দরে
যোদ্ধাবীর শুয়ে আছে অনন্ত-শয্যায়,
লেহনে ব্যাপৃত ব্যাঘ্র শোণিতের ধারা,
দোর্দণ্ড প্রতাপ সূর্য আগুন ছড়ায়।

আগুন ছড়ায়!

১। স্তেফান কারাজা, দেশপ্রেমিক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের দল-নেতা। তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে অসমযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন। হাজি ডিমিতরের সমসাময়িক।

ইভান ভাজোভ ॥ ১৮৫০-১৯২১ ॥

অনির্বাণ শিখা

বিষণ্ণ দিনের মাঝে সূর্য-স্বর্ণালোক
বয়ে আনে আনন্দের ধারা
নিথর আঁধারে তবু রশ্মি যেন তার
প্রতি প্রাণে রোমাঞ্চ জাগায়।

একটি নক্ষত্র একা মহাকাশে সেও
সাগরে নাবিকে দেয় পথের নিশানা,
একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র জ্বালাতে সক্ষম
অভ্রস্পর্শী আগুনের লেলিহান শিখা।

যে আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছেন হুস্
যে আগুনে এ পৃথিবী হয়েছে প্রোজ্জ্বল,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অন্ধকার তারাহীন রাতে
চরাচর উদ্ভাসিত বিদ্যুত ঝলকে।

অত্যাচারী, নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত হবে তুমি!
অনির্বাণ প্রজ্জ্বলিত রবে দীপশিখা!
যে শিখাটি আজ তুমি করো নির্বাপণ
আগ্নেয়গিরির মতো কালে তার হবে বিস্ফোরণ।

এ ধরাতে সবকিছু হয় অবসান।
যারা আজ সিংহাসনে আছে অধিষ্ঠিত
কালের করাল ক্রোড়ে অবলুপ্ত হবে,
কৃমিকীটের খাদ্যে হবে পরিণত।

একটি আলোক শিখা জ্বলে অনির্বাণ
অসীম বিভ্রান্তি মাঝে একাকী উজ্জ্বল,
বিশ্বের আদিতে আছে এ আলোক বর্তিকা
ধ্বংস মাঝে এর তবু হবে না বিনাশ।

সমাধিস্থ করো একে অন্ধকার কূপে
দ্বিগুণ আলোকে সে হবে উদ্ভাসিত
হত্যা যদি করো একে প্রমিথিউস প্রাণে
আবার উঠবে জ্বলে ভলটেয়ার বুকে।

মনোরম আকাশের বুক থেকে আজ
লোপ যদি পায় সূর্যদেব
নরকের হুতাশনে কেউ
আমাদের আলোক যোগাবে।

আমার গান

সময় হলে আমিও যাবো চলে,
তৃণে আচ্ছাদিত হবে সে-পথের রেখা,
কেউ দেবে অভিশাপ, কেউ ভাসবে চোখের জলে,
আমার কবিতা তবু পড়বে সবাই।

অনেক নামের ভিড়, সত্তার গৌরব
নিশ্চিহ্ন করে দেবে কালের মার্জনী
অথবা হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির তলে,
আমার কবিতা তবু পড়বে সবাই।

সত্য, স্বাধীনতার আহ্বান ছত্রে ছত্রে তার
প্রেম, ভালোবাসা তাকে সৌষ্ঠবে ভরেছে
প্রকৃতির রূপ হতে নানা রংয়ে আঁকা,
আমার কবিতা তাই পড়বে সবাই।

বল্‌কানের সঞ্জীবনী বায়ু এতে প্রবাহিত
গোপন সুরের রেশ বাজে রিনি রিনি
জনতার সংগ্রামের বজ্র-কঠিন নির্ঘোষ,
আমার কবিতা তাই পড়বে সবাই।

যা কিছু সৌন্দর্য ছিল, যা কিছু সম্পদ,
অমূল্য রত্নরাজি, ফুলে সাজিয়েছে তাকে
তিলে তিলে আমার হৃদয়,
তারি মাঝে জাগে তার জীবন স্পন্দন।

অশালীন চিৎকার বা গঞ্জনাতে কি বা আসে যায়—
হিংসার আগুনে জানি পুড়েছে অনেকে—
স্থিরচিত্তে দেখি ছবি আগামী কালের
আমার কবিতা জানি পড়বে সবাই।

বেঁচে রবে তারা জনতার মৃত্যুহীন প্রাণে,
আমাদের স্বাধীন স্বদেশে, বেদনা-উল্লাসে,
যতোদিন স্পন্দিত হবে তাদের হৃদয়
আমার কবিতা জেনো পড়বে সবাই।

বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে
ফেনিল পাত্র হাতে বিশ্ব তাকে করে অভ্যর্থনা,
সঙ্গীতে মুখর, চোখে স্বপ্ন মায়া সমাগত সুখের আশায়—
ভাবনার ছাপ শুধু চিন্তাশীল মনে।

নূতন শতাব্দীতে করি পদক্ষেপ, নয় নব দিনে,
কঠিন সমস্যা সব অতি পুরাতন,
অন্যায় রাজত্ব করে, অত্যাচার সত্বারূঢ় নিজের আসনে
বন্ধন শৃঙ্খল ঝঙ্কার তেমনি কঠিন।

অনেক দুঃখের বোঝা পুরানো শতাব্দী
তুলে দেয় নূতনের হাতে—যেমনটি পেয়েছিল সে,
দূর হবে বিকৃতি যত জমা হয়ে আছে নিরবধি···
দাঁড়াবে কি সে এ শতাব্দীতে বাস্তবের বেশে!

অথবা আবার চলবে বিশ্বময় পেষণের চাকা,
নগ্ন অত্যাচার—বিবেকের নেই স্থান শাসকের মনে,
তৃষাতুর মানুষের কি আশায় শুধু চেয়ে থাকা
ন্যায়, শান্তি, সুখময় নীড়ের সন্ধানে।

যাবার আগে

বরফে আমার চুল ঢেকে গেছে,
জমা হয়েছে ফেলে আসা বছরের শুভ্রতা,
যৌবনের চঞ্চলতা তবু প্রাণোচ্ছল
কখনো বা শান্ত সমাহিত, কখনো উদ্বেল,
এখনো হৃদয়ে আমার শিহরণ আনে।

দিনে রাতে তাকে আমি অনুভব করি,
তাই এতো ত্বরা মোর, বসন্তের ঊষা সমাগমে
ভোরের পাখীর মতো
গানে গানে ভরে দিতে চতুর্দিক
জীবন্ত, বলিষ্ঠ, যা আমার আছে।

তাই যতো তাড়াতাড়ি পারি, আমার স্বপ্ন, বিক্ষোভ,
প্রাণের আকুতি, মনের আগুন,
আমার শেষ গানগুলি,
আমার অন্তিম প্রেরণা,
হে স্বদেশ, তোমাকে যে দিয়ে যেতে চাই।

তুমিই দিয়েছো সব, সকলি তোমার
চয়ন করেছি তোমার বন্ধুর পর্বতে
তোমার উপত্যকা আর ছন্দিত প্রান্তরে
তোমার মহিমা আর বীরগাথা থেকে—
তোমার অজস্র ফুলে গেঁথেছি এ মালা।

রাত্রি তলিয়ে যাবে নৈঃশব্দ-সাগরে
সমাধি চিরন্তন মূক হয়ে রবে—
থাকবে না কণ্ঠস্বর, না চোখের আলো,
যতক্ষণ মন্দিরে তব জ্বলে দীপমালা
ভরপুর থাকে যেন শব্দের তরঙ্গে।

বাজ এবং শামুক

স্তারা প্লানিনার[১] গায়ে
উঁচু এক শিরীষ গাছের মাথায়
ছোট্ট একটি শামুক দেখতে পেল বাজ
কুঁজো পিঠ
শুঁড় বার করা
সাপের চাইতেও ঘিনঘিনে
স্বয়ং শয়তানের চাইতেও কুৎসিত সাজ···
—এটা আবার কি এখানে ?—
প্রশ্ন করলো নভোচরপতি
তাইতো, শামুক এযে ! খেলনা এতো
জানি প্রকৃতির।
করোটির মাঝে ঢাকা ছোট্ট এক প্রাণী
যেন এক চলমান মাথা,
ঘৃণা বা হাসির খোরাক দেব-দেবীদের···
—বল্ দেখি, করুণা হয় তোকে দেখে,
কি করে উঠলি তুই এতটা উঁচুতে ?
—বুকে হেঁটে হেঁটে।
শামুক জবাব দেয়
শুঁড়েল মাথাতে।

(১) স্তারা প্লানিনা—প্রাচীন পাহাড়। বলকান পর্বতমালার মধ্যভাগের একটি অংশ স্তারা প্লানিনা নামে অভিহিত।

কুড়ুল এবং গাঁইতি

মরচে-ধরা এক গাঁইতি, জানিনা কোথায় পড়েছিল ভুলে,
জিজ্ঞাসা করলো ঝক্‌ঝকে কুড়্বলকে : "কেন বলো
মুখ তোমার সদাই উজ্জ্বল ?
আমিও তো তৈরী সেই একই লোহা গেলে
তবে কেন মসৃণ নই আমি, নই পরিষ্কার
যেমন তোমার আকার ?
আমাদের মাঝে এত বিরাট প্রভেদ
কোথা থেকে এলো ?···" "এত কেন খেদ,"
কুড়্বল জবাব দিল : "রোজ আমি ঘুরি বনে বনে
কাটি কাঠ···রেখ জেনে
কঠোর পরিশ্রমে দেহ মোর হয়েছে মসৃণ,
সৌন্দর্যের চাবিকাঠি আছে বন্ধু শ্রমে।"

পেনচো স্লাভেইকোভ ॥ ১৮৬৬-১৯১২ ॥

বনের পাশে আঁকাবাঁকা পথ

বনের পাশে আঁকাবাঁকা
অন্তহীন পায়ে-চলা পথ—
পথের ধারে ছোট্ট অগ্নিকুণ্ড
নিভে যেতে ধোঁয়ায় পড়ে ঢাকা।

নিবু নিবু, হঠাৎ যেন তবু
অগ্নিশিখার জিহ্বা ওঠে জেগে,
দুধেল সাদা উঁচু সিঁড়ির মতো
আকাশ ফুঁড়ে ওঠে ধোঁয়ার রেখা।

ভোরের দেরী নেই, দিগন্তে
দেখা দেয় শুকতারাটি এসে
অগ্নিকুণ্ড যে জ্বলছিল পথপ্রান্তে
ধীরে ধীরে নিভল অবশেষে।

নাম না জানা কোনো পথচারী
জ্বেলেছিল আগুনটুকু বিশ্রামের আশে,
ক্লান্তি হলে দূর···ভোরের দেখে দেরী
পথে আবার গেছে চলে আপন উদ্দেশে।

কোন পথের পথিক এখন সে ?
কোথায় আবার রাত্রি হবে, কোন অচিনপুর ?
কোথায় সে জ্বালবে আগুন, কোন পথের পাশে
শ্রান্ত দেহের ক্লান্তি করতে দূর ?

কতোই যে ছোট ছোট এমনি অগ্নিকুণ্ড
জ্বালিয়ে দিয়ে ক্ষণকালেই বিদায় নেয় সে !
ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই দু দণ্ড
আবার সে পথের পথিক দেশে বিদেশে।

যেখানে যৌবন

যেখানে যৌবন, সেখানেই স্বর্ণাভ সূর্য সমুজ্জ্বল
সোনার স্বপ্নেরা তখন হৃদয়ে উচ্ছল,
যেখানে যৌবন, সেখানেই পথ চলা সোজা
বিশ্বের দুর্গম স্থান যতো, সব যায় খোঁজা।

যেখানে যৌবন, সবকিছু হাসিখুসি সেথা,
হৃদয়ে ফেলে না ছায়া কোনো দুঃখ ব্যথা ঃ
দুঃখ, সেও আনন্দের উৎসমুখে হয় পরিণত
তারুণ্য যেখানে, আহা, যৌবনের সেখানে রাজত্ব।

কিরিল খ্‌স্তোভ ॥ ১৮৭৫-১৯৪৪ ॥

ভবঘুরে

স্বপ্নের ঘোরে যেন দিন গেছে কেটে,
পৃথিবীর পথে পথে ঘোরে ভবঘুরে,
ছিল সে তরুণ—আশ নাহি মেটে
দেখে সাগরের ঢেউ তীরে বসে দূরে।

চলে গেছে সে—গেছে চলে চিরতরে—
অভাব হয়নি তার ফেনিল ফোয়ারা,
বিশ্বের অজ্ঞাত কোণে, দূরে, দূরান্তরে—
অভাব হয়নি তার সাকী আর সুরা।

ধীরে ধীরে ঘুরে গেছে বছরের চাকা···
স্বপ্নের ঘোরে যেন—উদ্ভট স্বপ্নের ঘোর···
জীবনকে উপভোগ করা– অসম্ভব শান্ত হয়ে থাকা,
জীবন-যৌবনের প্রতি মমতা দেখানো, অবান্তর।

তারপর এলো সেই বিভীষণ দিন—
দেহের কঠিন পেশী ক্রমেই শিথিল,
হঠাৎ বিস্মিত করে বার্ধক্যের হ'ল আগমন,
পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা তার তবু অবিচল।

তারপর একদিন তার দৃষ্টির সম্মুখে
অজ্ঞাত তটরেখা কোনো জাগল দিগন্তে
অবশেষে সেই তীরে তরীখানি থেমে,
বৃদ্ধদের ছেড়ে চলে যায় আপনার পথে।

তখন হঠাৎ যেন নাবিকের ফিরল সম্বিত্,
হঠাৎ তখন যেন চাইল সে অপনার পানে…
অভিশাপ দিল না সে নিজের ভাগ্যকে,
বিগত যৌবনের তরে নেই খেদ মনে!

পুরানো পথ

গায়ে গায়ে ঘেঁষা শিরীষ বনের মাঝে
চলে গেছে পাক্‌দণ্ডী পথ।
বহুকাল হ'ল, যেতো আপনার কাজে
পাহাড়ীরা ধরে' এই পথ।

তবু হরিণ আর দ্রুতপদ কাঠুরের দল
বনে যারা চলা-ফেরা করে
নব নব পথরেখা আঁকে, পুরানো পথেরা
ঢেকে যায় ঘাসে, ঝোপে ঝাড়ে।

বছর পেরিয়ে যাবে, সাহসী পাহাড়ী
আরো সহজ পথের করবে সন্ধান—
পড়ে' রবে পদচিহ্নহীন কতশত পথ
বুকে ক'রে শতাব্দীর শিরীষের বন।

গ্রীষ্মের রাত

ঘুমঘোর সকালের স্বপ্নালু আলোকের মাঝে
দেখা যায় সুদূরের নীল বনরেখা,
স্বচ্ছ নীলাকাশ, ভাসমান মাথার উপরে,
ছায় ধীরে রক্তরাগছটা।

হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে আঁকাবাঁকা পথে
নক্ষত্র লুকিয়ে মুখ আকাশের বুকে
বিদায় জানায় যেন প্রেমোচ্ছল চোখের দৃষ্টিতে,
টলমল করে যেন অশ্রুবিন্দু চোখে।

দিমিত্‌র পোলিয়ানোভ ॥ ১৮৭৬-১৯৫৩ ॥

সিগ্‌ন্যাল

রাত শেষ হয়ে আসে। নিজ স্থানে স্থানু
গর্বোদ্ধত শির, সাবধানী, নির্বাক,
ইস্পাতের খঞ্জে রেখে আপনার হাত
দাঁড়িয়ে সঙ্কেতদণ্ড, কৃষ্ণকায় অশরীরী যেন।

গভীর প্রতীক্ষায় দৃষ্টি তার দূরে প্রসারিত...
অস্পষ্ট শব্দের জোয়ার অন্ধকার প্রান্তরের বুকে,
ভীষণের পূর্বাভাষ দূর থেকে আসে ভেসে
সর্বগ্রাসী দুর্নিবার ঝড়ের সঙ্কেত।

আওয়াজ নিকটে আসে—বজ্রের নির্ঘোষ।
যন্ত্রণা-কাতর হৃদয় যেন করে আর্তনাদ,
আর্তস্বরে বার বার একই প্রশ্ন তার ঃ
বলো, হে সঙ্কেতদণ্ড, কোনদিকে খোলা আছে পথ ?

সর্বজ্ঞ সে ! নীচু ক'রে দেয় তার হাত
দুঃসাহসী গাম্ভীর্যের মাঝে—আর মুহূর্তেই
নির্দেশক ছোট তীরখানি দেয় পথের নির্দেশ,
নির্দেশ স্বাধীন পথের, নূতন, মহান...

তখন জাগ্রত জীবনের ধাবমান ট্রেন
ঝঞ্ঝাবেগে ধেয়ে চলে সমুখের পানে,
পূবদিকে গতি তার, যেথা জন্ম নেয় দিন,
যেখানে উজ্জ্বল দেশ গোলাপী আভায়।

বিষবৃক্ষ

অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে আসে মহাকাশ
অশুভ অশরীরী বিষবৃক্ষ যেন আরো হয় নীল…
প্রোথিত হৃদয়ের মাঝে রস-টানা শিকড়ের মতো
আকণ্ঠ করে সে পান রক্তের সলিল।

ক্রমে ক্রমে বড়ো হয়, আরো, তারপর ঘন শাখা
প্রসারিত করে রাক্ষুসে ডানার মতো চতুর্দিকে,
অন্ধকারে ফেলে ছেয়ে নিজের আকাশ
উজ্জ্বল দিনের মাঝে রাত্রি আনে ডেকে।

সেথায় উজ্জ্বল রং জ্বলে ওঠে রক্তিম আভায়,
কিন্তু তারা অভিশপ্ত বিখণ্ডিত প্রাণ;
সেখানেও সঙ্গীতের রেশ, বিলাপের প্রায়
গায় নারী অসহায়, শিশু গৃহহীন।

পাতার মর্মরধ্বনি সেখানেও জাগে—
নির্যাতিত দাসত্বের চাপা আর্তনাদ
তিক্ত ক্রন্দনের রোল স্বজনের শোকে,
কবরের নিদ্রায় যারা পেল অনন্তের স্বাদ।

দুরন্ত তুফান সেথা ক্রোধে সগর্জন
ধেয়ে এসে থেমে যায়, পরিণত হয় গোঙানিতে :
এ ঝঞ্ঝা সে মহাপ্রাণ, ব্রত যার দানব-নিধন,
স্বর্গ রচনার তরে এ নরক ভূমিতে…

…যুগ যুগ ধরে চলেছে এ তীব্র দ্বন্দ্বযুদ্ধ—
শক্তিমান হয় বৃক্ষ, মাথা যেন মেলে তার পাখা।
বিকৃত গৌরবের মসীলিপ্ত জ্যোতিশ্চক্র থেকে
পরে নাকো ঝরে’ কোন পল্লবিত শাখা…

দেখ চেয়ে! ঝড় যাকে পারেনি টলাতে,
দগ্ধ যে হয়নি আগুনে, ধরাশায়ী কুঠার আঘাতে!
দেখনি, কী শক্তি ধরে কাঠুরের হাতে?
অথবা কেমন করে শালপ্রাংশু লুটায় ভূমিতে?—

শক্তি আরো দাও মহাপ্রাণে, অস্ত্রে দাও শাণ!
দৃঢ় করো বাহু, এস অস্ত্র নাও হাতে—
জীবন প্রতীক্ষারত মহাবলিদান!
বিষবৃক্ষ করো উৎপাটন সবে এক সাথে!

পেইয়্ ইয়াভোরভ ॥ ১৮৭৮-১৯১৪ ॥

শিলাবৃষ্টি

"এক, তারপর দুই, তারপর তিন, তিনটি কঠোর
আর অবিস্মরণীয় বছর···ভগবান,
হয়তো কোনো পাপে তুমি, সর্বশক্তিমান
দিয়েছো এ শাস্তির বিধান।
কোন্ সে দুর্মুখ—
দুর্দশা জর্জরিত কোনো দুর্বল মুহূর্তে
করেছিল তোমাকে আঘাত?
কলেরা-বসন্তে উজাড় হওয়া, সে-ও ছিল ভালো,
কবরের নীচে ক্ষুধায় জ্বলে না পেট
তৃষ্ণায় ফাটে না ছাতি!
আমাদের কপালে হায় জুটলো শিলাবৃষ্টি,
কপালে জুটলো শুধু ঘোলা-জলের স্রোত
হিমে জ্বলে-যাওয়া—আর ছিল খট্‌খটে দিন—
সোনা রং ধরছিল শস্যের ক্ষেত···"

তুষারাবৃত শীতকাল শেষ হ'লো,
বৃষ্টিঝরা বসন্তও নিয়েছে বিদায়,
গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতেজ
বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেতে ঢালে স্বর্ণকণা।
মাঠভরা ফসলের গায়ে রং লাগে
নুয়ে পড়ে দানাভরা শীস্
তারি সাথে আশার প্রশান্তি
উঁকি মারে চাষীদের বুকে।

মনে লাগে খুশীর আমেজ,
মুখে তার হাসি ফুটে ওঠে,
চাপা দীর্ঘশ্বাস তবু, দুটি হাত জুড়ে
ঈশ্বরে প্রার্থনা জানায়।
"হপ্তাটাক আরো এমনি থাকে যেন
এক হপ্তা আরো থাকে যেন খরা,
অবসান হবে তবে এ দিন কঠিন
ঘুচাবো দুঃখ তবে এবার আমরা।"

যতক্ষণ শক্তি থাকে দেহে
একটানা পরিশ্রম করে চাষী বিশ্রাম বিহীন…
আরামের অবকাশ পাওয়া যাবে শীতে।
এখন ক্ষণিক তন্দ্রা, তারপর ফের জেগে ওঠা :
মোরগের কর্কশ স্বর তখনো নিরব,
কুকুরের পাল ঘুমে অচেতন—
তৈরী সে মাঠে যেতে…"হেই গো,
হাট থেকে এনেছো রশি মনে করে ?"
কাক পক্ষীর আগে জেগে ওঠে বউ, সবকিছু
আছে গোছগাছ। কিন্তু তবু
জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে,
কাল ভোরে কাস্তের শাণে ধরা দেবে
আঁটি আঁটি গম ; তাই তার দুরু দুরু বুক।
অস্থিরতা যেন
পেয়ে বসে তাকে, ছুটে যায় আঙিনায়
আবার সে ফিরে আসে ঘরে,
কে জানে কিসের খোঁজে…"শুনছো বৌ
জোগাড় হয়েছে আরো সাত জোড়া হাত!—
ভানিও বাবা, কুড়ের বাদশা, ওঠো এবার।
পূবদিক লাল হয়ে এলো
সূর্য উঠতে দেরী নেই আর

গরু-বাছুর ডাকছে গোয়াল ঘরে।"
ঘুম চোখে ভানিও হাই তোলে
আধো আঁধারে যায় গোয়াল ঘরে,
শিভচো গাই তার ভেজা নাক ঘ'সে
ভানিওকে আদর জানায়।
"জাগ তোরা জাগ!"—কর্তা আবার হাঁকে
আঙ্গিনাতে, পেরেক
ঠুকতে ঠুকতে গাড়ীতে,—"ঢের হয়েছে..."
ততক্ষণে পাশের আঙ্গিনা মুখর কোলাহলে,
কেউ গলা ছেড়ে বকা-ঝকা করে,
কাছেই কোথাও হাতুড়ির ঠকাঠক্
সুর তোলে নেহাইয়ের বুকে।
ভোরের স্নিগ্ধ বাতাসে
দূর থেকে গ্রামে ভেসে আসে
গরুর গলায় বাঁধা ঘন্টার ধ্বনি;
হাম্বারবে মুখরিত চতুর্দিক...
গ্রাম জুড়ে জেগে ওঠে জীবন স্পন্দন।
সূর্যদেব আকাশের পথ পরিক্রমা করে,
অগ্নিবাণে করে জর্জরিত এ ধরার বুক।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত। ভীষণ গুমোট,
সকলে ভয়ার্ত চোখে চায় উর্ধ্বপানে
হাতে মুছে কপালের ঘাম
দীর্ঘকাল চেয়ে থাকে আকাশের দিকে
ধূসর বরণ মেঘ করে আনাগোনা।
সূর্যের মুখ ক্রোধে আরক্তিম
দক্ষিণ দিকচক্রবালে দেখা দেয় মেঘ,
ধেয়ে এসে ধরে ফেলে তাকে।
নীচে মাথার জটলা করে কানাকানি...
মোরগের চিৎকার শোন, নিশ্চিত সঙ্কেত!

নদীতে হাঁসের পাল কেন
ঝাপটায় পাখা, তাদের কর্কশ ডাক
কোন্ অশুভের জানায় ইঙ্গিত ?

*

যাও ফিরে যাও বিশ্বাসঘাতক মেঘ,
তোমার নষ্টামির আছে সময় অনেক—
হপ্তা এক, দুই...এসো তার পরে
হে ভাস্কর ! মেঘ তবু চলে বেড়ে
প্রসারিত ক'রে তার লোমশ কর্ষিকা
সূর্যকে করে গ্রাস, সমস্ত আকাশ
জুড়ে নামে অমানিশা···নির্দয় নিষ্ঠুর !
ফণা তুলে আসে বুঝি দুর্ভাগ্য আবার
সকলে আশ্রয় নেয় নিজ গৃহকোণে
কম্পিত হৃদয়ে নিদারুণ ত্রাস হানে,
মাথার উপরে, আধো আলো-ছায়ে কুরুক্ষেত্র যেন···
ঘূর্ণীঝড় আর ধূলো···আকাশ আচ্ছন্ন
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে বিদ্যুত ঝলকে—
আবার-আবার—হে ঈশ্বর ! বাজের গমকে
প্রতিধ্বনি জাগে প্রান্তরে পর্বতে—
থরো থরো কাঁপে মাটি···শিলাবৃষ্টিপাতে—
নুড়ি পাথরের মতো···থামো···পায়ে পড়ি···
রক্তঝরা শ্রম, ভগবান, দয়া করো হরি !

*

হলো শেষ। একটানা বাজের আওয়াজ
ক্রমে ক্রমে মিলায় সুদূরে।
হিমেল বাতাস নেকড়ের মতো
তাড়া ক'রে নিয়ে যায় মেঘ।

গগনে সূর্যদেব আবার প্রোজ্জ্বল।
বৃদ্ধ, যুবা, শিশু কাতারে কাতারে
চেয়ে দেখে সকরুণ চোখে;
গ্রাম ছেড়ে মেঠো পথ ধরে নগ্নপদে
মৃত্যুর ছোপ-লাগা মুখের মিছিল—
চিরন্তন দুর্দশা তাদের ঠেলে নিয়ে যায়
শূন্য, বোবা শস্যক্ষেত মাঝে।
মদমত্ত ঝড় সেথা কেটেছে ফসল
যব, গম, ধান আর রাই—
কিছুই রাখেনি বাকী, কাঁচা আর পাকা,
নির্মূল করেছে সব বর্ণালী প্রত্যাশা।

তুমি আসবে জানি

তুমি আসবে জানি, প্রত্যাশিত দিন।
দেহের সকল শক্তি হয়েছে নিঃশেষ
দীর্ঘ রাত্রি জুড়ে জেগে নিদ্রাহীন।
তুমি আসবে জানি ত্রাণ-কর্তা দিন
সোনালী কিরণমালার ছড়িয়ে আবীর
অনন্তের দিকে স্থির-দৃষ্টি দু-চোখ গভীর,
উষালোকে হবে উদ্ভাসিত আমার জীবন।

তুমি আসবে জানি, প্রত্যাশিত দিন।
রক্তচোষা বাদুড়ের দল ধ'রে সারারাত
নির্দয়ে করেছে পান আমার শোণিত।
তুমি আসবে জানি, ত্রাণ-কর্তা দিন।
আলো আর আঁধারের সাগরের মাঝে
ফুঁসে-ওঠা তরঙ্গের সাজি
নেবে তুলে ধীরে এক রক্তঝরা প্রাণ।

তুমি আসবে জানি, প্রত্যাশিত দিন।
সাথী হয়ে তোমার আসবে প্রবীর
অনিদ্রার মাঝে দেখা স্বপ্ন শান্তির।
তুমি আসবে জানি, ত্রাণকর্তা দিন।
দীপ্তির উজ্জ্বল ছটায় প্রখর সূর্যের
যদিও আমার চোখে ঘনাবে আঁধার,
তোমার প্রভুত্ব আমি নেব মেনে প্রশ্নহীন।

তুমি আসবে জানি, প্রত্যাশিত দিন।
সাথে করে বার্তাবাহী সুদীর্ঘ ঝঙ্কার
ভোরের স্বপ্নালু গানের চেয়ে অনেক মধুর,
তুমি আসবে জানি, ত্রাণকর্তা দিন।
তখন করুণাভরে—
আত্মা অশরীরী—অশ্রুধারে
ভেজাবো নিজের শীতল দেহ প্রাণহীন।

তুমি আসবে জানি, প্রত্যাশিত দিন!

ছায়া

অন্ধকার রাত্রির গভীরে দেখি ফুটে ওঠে
দুটি কালো ছায়া ঃ সাদা পর্দার ওধারে
যেখানে জ্বলছে বাতি, আলোকবৃত্তের মাঝে
গভীর রাতে দুটি ছায়া…মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একাকী,
একে অন্যের জন্য আর্ত তৃষ্ণায় অধীর
দুটি ছায়া—একটি পুরুষের ছায়া, অন্যটি নারীর।

দুটি মাথা কোনোমতে আসে কাছাকাছি
শুনতে পাবেনা ওরা—শুনতে চায় তবু অপারগ,
হয়তো বা মৃদুস্বরে কথা বলে ওরা, কার ভয়ে ভীত ?
আবেগকম্পিত দুটি জোড়া হাত ধরা দিতে চায়
কিন্তু স্পর্শ করতে পারে না—বৃথা চেষ্টা শুধু বারবার
তবু তারা মুখোমুখি, পরস্পরের আকর্ষণ দুর্নিবার।

হয়তো তারা ফিসফিসিয়ে কথা বলে, অথবা চিৎকার,
হয়তো বা তাদের কণ্ঠে আর্তনাদ—শুনতে পাবে না তারা,
রাতের গভীরে দুটি ছায়া…একরাশি আলোকের মাঝে—
শুনতে পাবে না তারা, পাবে না স্পর্শ করতে।
একে অন্যের জন্য আর্ত তৃষ্ণায় অধীর,
দুটি ছায়া—একটি পুরুষের ছায়া অন্যটি নারীর।

নীল কুয়াশায়

জানালার পাশে বসে দেখি একদল ছেলে—
তাদের নির্মল মুখে বসন্তের আভা—
বাইরে খেলায় মত্ত, সকাল এখন তাদের দখলে।
পাণ্ডুর হয়ে যায় কতো বর্ণের প্রভা।
বসে বসে দেখি—স্মৃতি সব আসে ভিড় করে।
অজ্ঞাতেই দৃষ্টি যায় চলে সুদূরের পানে
অনেক পথের রেখা মিলেছে যেখানে
কে আসে এদিক পানে— কে যায় দূরে
দিগন্তের প্রাচীর যেথায় রূপালী হাওয়ায়
যাতায়াত প্রতি মুহূর্তেই জীবন মৃত্যুর।
সম্মানে ভূষিত হবে কে, কার পরাজয় ?
হে ছেলের দল, তোমাদের তরে উৎকণ্ঠা আমার।

সূর্য নিজ পথ পরিক্রমা করে শেষ
আচ্ছাদনহীন তোমাদের মাথার উপরে,
মেঘে মেঘে ছেয়ে যায় সমস্ত আকাশ।
এ গুমোট জানা আছে মোর, ঝড় আসে তেড়ে।
বহুকাল প্রতীক্ষায় আমি—শেষপ্রান্তে নিজের দিনের
বেদনা মাখানো হাসি-মুখে তোমাদের দেখি।
অবসর কালে মোর কার ভৎর্সনার অপেক্ষায় থাকি ?
অপেক্ষায় আছি শুধু পর্দাটি জানালার
কখন নামবে নীচে, মধ্যদিনে উদ্ভাসিত হবে
বিদ্যুত ঝলকে, বাইরে তুফান
তোমাদের উদ্দাম কোলাহল স্তব্ধ করে দেবে।
দৃষ্টির অতীত আমি, ঘুমে অচেতন।
ধূলোবালি মাখা তোমাদের দেহে সন্ধ্যার সমীর
অবশেষে প্রলেপ বুলাবে, ক্লান্তিভরা চোখে

ফিরে আসবে ঘরে। নিরানন্দ স্মৃতির অঙ্গার
তীব্র তেজে প্রজ্জ্বলিত রবে বুকে
যেন কোন বিঁধে-থাকা বিষমাখা তীর।
আর ধীরে গোধূলির শেষ স্বর্ণরাগ
মিলাবে পর্বত শিরে, রেখে যাবে স্বপ্নের পরাগ
আর সেই নীল ঘন কুয়াশা গভীরে
যখন শব্দেরা ছুটি নেবে, নিস্তব্ধ হবে চতুর্দিক,
যখন বসবে জানালার পাশে উদাস নয়নে
আমাকে স্মরণ ক'রো তোমরা অভীক
জানিয়ো শুভরাত্রি মোর কানে কানে।

স্ত্র্‌মার গোপন কথা

দ্রুতগতি বয়ে চলে স্রোতস্বিনী স্ত্র্‌মা,
লুকানো গোপন কথা হিম বুকে তার,
ছুটে চলে, নিঃশব্দ, নির্বাক,
শুধু মাত্র ঝরাপাতা ঝাঁক
ভেসে চলে খরস্রোতে তার।

ছুটে চলে দ্বিখণ্ডিত পাহাড়ের কোলে,
সকরুণ প্রতিধ্বনি অচিরে মিলায়,
কঠিন শিখর 'পরে অন্ধকার ঢলে,
সুঠাম গৃহের সারি বুকে ছায়া ফেলে
ছুটে যেন চলে তার তরঙ্গ দোলায়।

মুহূর্তেই বাধা পেয়ে রুদ্ধগতি তরঙ্গের!
বুঝি সে শুনেছে কোনো প্রিয় কণ্ঠস্বর,
সবকিছু চারিদিকে নিস্তব্ধ নিথর।

সেদিনের পরাজয় পড়েছে কি মনে
শত শত বৎসরের স্মৃতি মাঝে আজ?
শহীদের রক্তের বাষ্প জমাট এখানে,
অসংখ্য আর্তনাদ সম্মিলিত উদাত্ত আহ্বানে:
প্রতিশোধে করো দূর ধর্ষণের লাজ।

গম্ভীর পিরিন পাহাড় শোনে সে বারতা,
প্রস্তর ললাট তার ঋজু সমুন্নত,
জানে সে এ অন্ধকার ছায়ার হিংস্রতা
বেলাসিৎসা করবে গ্রাস, অন্তরের ব্যথা
তার অগণিত সমাধির ক্ষত।

খরস্রোতা স্ত্রুমা মাতে অশ্রুত সঙ্গীতে,
অগুন্তি গাছের শাখা তার দেহতে লুটায়
কানে কানে কথা যেন ভরা মিনতিতে—
ঈজিয়ান সাগরের উজ্জল শুভ্রতা
কালো কালো পাতা দিয়ে ঢেকে দিতে চায়।

মধ্যরাতের হাওয়া

মধ্যরাতের হাওয়া
ঝরায় দুটি পাতা,
দুটি পাতার যূথ
যাত্রী মৃত্যুপথে,
হেমন্তের স্পর্শ পায়নি তারা
শীত অনেক দূরে,
ঝরলো দুটি পাতা
নীরবে মধ্যরাতে।

মধ্যরাতের হাওয়া
ঝরায় দুটি তারা,
বিষণ্ণ দুটি শিশু
দিত পথের দিশা,
ভগ্নপ্রায় গম্বুজের 'পরে
অশরীরীর মতো
ছিন্ন তন্ত্রী দুটি
দুটি শিশুর তৃষা।

মধ্য রাতের হাওয়া
ঝরায় অশ্রুবিন্দু দুটি,
তিক্ত অশ্রুবিন্দু দুটি
ক্ষমে অবশেষে,
দুটি দৃষ্টি অমলিন
দুঃখ-ওড়না ঢাকা
ব্যথায় হ'লো কালো
সিত স্বপ্ন দুটি।

মধ্যরাতের হাওয়া
ডোবায় দুটি তরী
যাত্রী তরী দুটি
নানান্ দেশে দেশে।
মধ্যরাতের হাওয়া
দুটি দৃষ্টি ঢাকে,
হারায় দৃষ্টি দুটি
অসীম ঢেউয়ের গ্রাসে।

মা-কে

খুঁজি না আমার গানে
মিথ্যা স্বস্তির বাণী,
অথবা, হৃতশক্তি শাসকের
অন্ধ একগুঁয়ে জেদ,
লক্ষ্য মোর নির্মম বিজয়
তাদের বিরুদ্ধে, অভিশাপ দিয়েছিল যারা,
ওগো আমার কালোমাটি মা,
তোমার শ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত সন্তানকে !

আমার শৈশবে
সে কোন্ নিয়তি
বারবার তোমার অজ্ঞাতে
মোর দোলনায় দিয়েছিল দোল,
স্ফটিকের মতো আমার হৃদয়
দিয়েছিল জুড়ে তার দুর্ভাগ্যের সাথে
আর আমার নিষ্পাপ পাখায়
অশুভ চিহ্ন তার দিয়েছিল এঁকে ?

আমি হেথা হায়, পরিচয়হীন
অসহ বেদনার বিষে জর্জরিত নীল,
যবে দক্ষিণের সুদূর দিগন্ত
ভাসে চাঁদের আলোয়,
স্বপ্নের মায়াচোখে দেখি যেন আমি
অসংখ্য জোনাকির আলো
আমার জন্মভূমির
সীমাহীন প্রান্তর জুড়ে।

তাই মোর ব্যাকুল জিজ্ঞাসা,
তারকাখচিত এ বংশের মাঝে
বহু অগ্নিপরীক্ষায় যারা হয়েছে উত্তীর্ণ
নির্বাচিত হইনি কি আমি
বেদনার স্থান যতো ক'রে উন্মোচন
দেহভরা ক্ষতস্থান থেকে
করি নিঃসরণ
পবিত্র প্রতিশোধের প্রচণ্ড আহ্বান।

নিকোলাই লিলিয়েভ ॥ ১৮৮৫-১৯৬০ ॥

বসন্তের বর্ষণ

বসন্তের দুরন্ত বর্ষার ঝর্ঝর
সঙ্গীতের তান তোলে মোর আঙ্গিনায়,
বসন্তের দুরন্ত বর্ষার ঝর্ণায়
কতো আশা ভর করে নূতন পাখায়।

বসন্তের দুরন্ত বর্ষার কণা
মাটির মিলনে এসে কাঁপে শিহরণে,
বসন্তের দুরন্ত বর্ষার ঝর্ঝর
বসন্তের রূপকথা বলে কানে কানে।

বসন্তের দুরন্ত বর্ষার ঝর্ঝর
অশ্রুজল, ভীতি আর পুলকস্পন্দিত,
বসন্তের দুরন্ত বর্ষার শেষে
জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ কতো হয় নিঃশেষিত।

উষা জাগে ঘুমন্ত উত্থানে

উষা জাগে ঘুমন্ত উদ্যানে।
শিশিরের প্রতিটি কণিকা
বুকে আঁকে প্রতিবিম্ব নীল,
ঘননীল গগন-বীথিকা।

জীবনের রূপালী কিরণ
গানে তোলে তান,
নম্রভরে করে আশীর্বাদ,
আশীর্বাদ করে চিরন্তন।

জেগে ওঠে নির্মোকিত প্রাণ
অসংখ্য আত্মপ্রবঞ্চনা মাঝে,
একটি স্বপ্নের আশে—নির্মল কোমল,
নির্মল, কোমল ধ্বনি বাজে।

নক্ষত্র পাণ্ডুর বর্ণ

নক্ষত্র পাণ্ডুর বর্ণ আকাশের গায়
ক্রুদ্ধ চাঁদ চেয়ে থাকে নির্বাক নিস্তব্ধ—
আগত মৃত্যুর দ্বারে কম্পিত হৃদয়
যুদ্ধ।

পথপাশে শয্যা নেয় শ্রান্ত সেনাদল
দোল দেয় প্রান্তরের স্তব্ধতা বিমুগ্ধ,
বার বার মনে তবু জাগে আতঙ্ক প্রবল,
যুদ্ধ!

স্বপ্নে তারা দেখে হায়, মধুর জগৎ!
সত্য-সাম দেশে তারা হবে সবাই সমৃদ্ধ
যেখানে বিরাজে শান্তি, যেথা হতে বিতাড়িত
যুদ্ধ।

হেমন্তের হিমেল সন্ধ্যা এসে চুপিচুপি
কেড়ে নেয় ঘুম, বিষাদের তরঙ্গ অবাধ্য
বিবেকের স্বচ্ছ চোখে ঠুলি ধরে চাপি ঃ
যুদ্ধ।

কান্নাভরা আকাশ উপরে দেয় খুলে
নিরুত্তাপ চাঁদের চাঁদোয়া,
আতঙ্কের মাঝে দুর্ভাগ্যের সব নদী এক হয়ে যেত ঃ
হেমন্ত, মৃত্যু আর যুদ্ধ।

স্বদেশের প্রতি

নির্বাক বিশ্ব মাঝে তোমার ক্রন্দন
পথ-হারা, তবু কেঁপে কেঁপে ফেরে।
মাগো মহীয়সী, কার প্রতি তব আবেদন,
আবদ্ধ যারা নিজ নিঃসঙ্গতা-ঘোরে।

শঙ্কাহীন হৃদয়ের তব এ দুঃখ মহান
কার কাছে রাখবে গচ্ছিত,
মনে হয় বুঝেছি সে ভাষা আমিই প্রথম,
সচেতন আমি, জানি নিজের অতীত।

আশাহীন ভাগ্যের নির্গুণ সন্তান আমি ;
জ্বেলেছো কি মোর প্রাণে আশার প্রদীপ ?
তোমা তরে স্পন্দিত হৃদয়, জানে অন্তর্যামী,
বেদনা তোমার রাখে সমুজ্জ্বল একটি নিষ্প্রভ দীপ।

নবজন্ম লভি' হয়তো বা আমি সর্বশেষ
অর্ঘ সাজাই মোর দীন প্রতিভার :
একটি হৃদয়, পূজারীর এই অবশেষ,
পরিচয়হীন, তব বেদীমূলে আমার সম্ভার।

দিমচো দেবেলিয়ানোভ ॥ ১৮৮৭-১৯১৬ ॥

শোক সঙ্গীত

মৃত্যুর পর জন্ম নিই শুভ্রালোক হয়ে—
অসংখ্য আনন, অবয়বহীন প্রাণ,
সারাদিন ধরে গড়ে তুলি অবিশ্রাম,
রাতে তাকে চূর্ণ করি নির্দয় নিষ্প্রাণ।

যখনি আহ্বান করি সমুজ্জ্বল দিন,
ফেটে পড়ে ঝড় অন্ধকার সাগরের বুকে,
আর যদি ছুটে চলি তুফানের পিছে
সমস্ত বিলাপ, মর্মরধ্বনি স্তব্ধ চতুর্দিকে।

অগ্নিস্রোতা উষার স্বপ্ন দেখি আমি,
প্রখর দ্যুতিতে তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ,
ফাল্গুনের দিনে হেমন্তের মতো প্রাণশক্তিহীন,
অথচ হেমন্তে আমি প্রস্ফুটিত বসন্তের দিন।

উন্মাদনাহীন সময়ের মাঝে অবিরত
নিঃশব্দে হারিয়ে যায় অভুক্ত জীবন,
কান্না আমার খুঁজে ফেরে ঘাট
সীমাহীন মরুভূমি মাঝে ভাসমান।

আত্মদান

উজ্জ্বল উষা-সমাগমে শ্রান্ত রাত্রির মহোৎসব
ডুবে যায় শান্ত তরঙ্গমালায়,
হৃদয়ে আমাদের ঠাঁই পাতে তৃষ্ণার দেবতা,
ঢেকে দিয়ে সবকিছু তার বিশাল ডানায়।

নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিদ্রার গভীরে,
প্রস্তুতি চলে যেথা নব নব রাত্রির উৎসব,
নিজেরাই রেখেছি খুলে পুষ্প কণ্ঠহার
আকণ্ঠ করেছি পান তৃষ্ণায় আসব।

অপরূপ মোহনের সাজে আগমন তার
ধীরপদে অনুভব করিনি কখন
আঙুলের ফাঁকে জ্বলে ওঠে মধুর অঙ্গার
সমস্ত শরীর ঘিরে আগুনের শিখা লেলিহান।

শুনি আমি আহ্লাদিত ঠোঁট ডুবে গিয়ে
দুগ্ধফেননিভ আমার জঙ্ঘায়
মোহনের সুরে আমাকে আবৃত করে
তরঙ্গের মতো—জ্বালাময়ী ঊর্মীমালায়।

উদ্দাম আকাঙ্খার টানে দৃষ্টি নিমীলিত
রক্তের কণায় বাজে সঙ্গীতের সুর,
শায়িত পেলবদেহ—শেষ শক্তি করে একত্রিত
বন্ধ করি চোখ—বেদনা বিধুর।

খুলি যবে ক্লান্তিমাখা দুটি আঁখিপাত
লেগে আছে ওষ্ঠাধরে স্বাদ অমৃতের,
ধোঁয়ার কুণ্ডলী দোলে আমার শিয়রে
যেন কোনো নবউৎসর্গীত নূতন বেদীর।

গোপন ব্যথা

এসেছো আবার ফিরে নিজ পিতৃগৃহে,
সন্ধ্যার আঁধার যখন নেমে আসে ধীরে
আকাশের শান্ত বুক ঢেকে দেয় প্রশান্তি রাত্রির
মমতার আলিঙ্গনে দুর্ভাগ্যের ব্যথা যায় দূরে।

ঝেড়ে ফেলে দুঃসহ ক্লান্তির বোঝা
অশান্ত দিনের ডাকে দিয়েছিলে সাড়া—
প্রত্যাশিত অতিথির সাথে মিলেছো উল্লাসে
চুপি চুপি পার হয়ে আঙ্গিনার বেড়া।

দ্বারপ্রান্তে শুক্লকেশা প্রতীক্ষায় রত
শীর্ণ কাঁধে তার তুমি মাথা গুঁজে থাকো,
প্রশান্ত হাসিতে তার তুমি যে বিলীন,
দীর্ঘকাল তোমার আবৃত্তি : মাগো, আমার মা গো !
ধীর পায়ে চলে যাও পরিচিত ঘরে,
অন্তিম বন্দর তোমার, শেষ পোতাশ্রয়,
কথা বলো স্তব্ধতার কানে মৃদুস্বরে.
ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে ধরে' দেয়ালের গায় ;
এখানে এসেছি আমি, অপেক্ষায় শান্ত সূর্যাস্তের,
আমার জীবন-রবি নিজ পথ পরিক্রমা শেষ...

হায়, এই প্রবাসীর গোপন ব্যথার নির্ঝর
বৃথাই স্মরণ করে মাকে, নিজের স্বদেশ !

এলেজি

তোমাকে রাখবো মনে যেমনটি ছিলে ঃ
গৃহহীন, আশাহীন. বিষাদের ছবি,
উত্তপ্ত তোমার হাত মোর হাতে ধরা
তোমার আনত মুখ হৃৎপিণ্ডের কাছে।
দূরে কাঁপে শহরের রেখা ধোঁয়াশার মাঝে
হিল্লোল জাগে গাছে শাখা-প্রশাখায়,
দ্বিগুণ পবিত্র যেন আমাদের প্রেম
সম্মুখে আগত আজ বিদায়ের ক্ষণে।

"ভোরে চলে যাবো আমি, এসো তুমি ভোরে
নিয়ে এসো চোখ-ভরা বিষাদের ছায়া—
মৃত্যুর মুহূর্তেও যেন ঠিক মনে পড়ে
তোমার মুখের সেই অপরূপ কায়া।"
—ওগো ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ ক্লান্ত, ক্লান্ত দূর্বাদল
প্রার্থনা মোদের রেখো সঙ্গোপনে—আমাদের ফাল্গুনের দিন
আমাদের স্বপ্নভরা রাত হয় নি যে শেষ,
মোর কাছে ফিরে তুমি আসবে আবার।

মাথার উপরে রাত জাগে ভয়ঙ্কর রূপ
বাদুড়েরা বোনে জাল দুর্ভেদ্য আঁধারে
তোমার দুর্বল মন আশা করে প্রবোধের বাণী,
কিন্তু আমি বিশ্বাস হারিয়েছি নিজের আস্থায়।

উত্তপ্ত তোমার হাতে ক্রমে নিলে টেনে,
অন্ধকারে পথ খুঁজে গেলে তুমি চলে ;
কান্নার শক্তিটুকু বুঝি অবশিষ্ট নেই।
তোমাকে রাখবো মনে যেমনটি ছিলে···

একটি মৃত্যু

শত্রু নাম তার ঘুচে গেছে চিরতরে—
শত্রুবাহিনীর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল
যেন এক বিশাল তরঙ্গ আঘাতে
আছড়িয়ে পড়ে দূরে বিপরীত তীরে।

অন্তিম শয্যায় সে শয়ান এখানে
ঝোপে ঢাকা বিবরের মাঝে,
বিষণ্ণ অসহায় দৃষ্টি ভরা চোখে
চেয়ে থাকে নির্মেঘ আকাশের পানে।

দখিনা বাতাসের লেহনে কবোষ্ণ
ধূসর মাটির বুকে হেথা,
নিঃসঙ্গ পড়ে আছে প্রয়োজনহীন
কয়েকটি চিঠি যেন রক্তাক্ত প্রশ্ন।

কোথায় নিবাস, পরিচয় তার কোন্ নামে ?
কার আহ্বান এনেছিল তাকে আমাদের কাছে—
আজ এই বিজয়ের সিংহনাদ মাঝে
পরাজিত, মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনে।

হায় দুঃখী মা'র প্রাণ কার
বুকে নিয়ে দুঃসহ বেদনার বোঝা
শুনিয়েছে বুঝি তাকে সান্ত্বনার বাণী
স্নেহের ফল্গুধারা নির্মল নির্ঝর।

হাস্যকর,অসঙ্গত এ মনোবেদন
ব্যথায় বিদীর্ণ এমন নিষ্ঠুর সময়ে।
একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রাণের সংহার,
তাই বুঝি অবশেষে দিয়ে গেল প্রাণ।

শত্রুর পতাকাতলে চলে কিসের প্রস্তুতি—
আমাদের তরে সে-কি দয়ার দাক্ষিণ্য ?
কিন্তু বিধিলিপি তার পরিপূর্ণ আজ,
শত্রু নয় আর, ললাটে তার মৃত্যুর বিভূতি।

খ্রিস্তো ইয়াসেনোভ ॥ ১৮৮৯-১৯২৫ ॥

আমাকে জাগিয়ে দিও, মাগো, হিমেল সকালে

আমাকে জাগিয়ে দিও, মাগো, হিমেল সকালে—
ঘুম ঘুম ঘোরে ঢাকা ভোরে ঃ
সূর্য দেখতে চাই আমি, ঊষার অরুণ
আর নীল বনরাজি দূরে।

পার হয়ে বিষাদের অন্ধকার মরু,
ভেদ করে দুঃস্বপ্নের ঘেরা বেড়াজাল,
শুনি আমি জেগে-ওঠা ফুলের বাগান
রূপালী ঝংকারে ভরা সোনার সকাল।

অন্তহীন আকাশের দেবতা বিস্মৃত—
কালো জলে ভাসে যেন তরী একখানি—
দেখি আমি আদিগন্ত স্বদেশ প্রান্তর
আমার পূর্বপুরুষের পুণ্য-জন্মভূমি।

আমাকে জাগিয়ে দিও, মাগো, হিমেল সকালে—
ঘুম ঘুম ঘোরে ঢাকা ভোরে ঃ
সূর্য দেখতে চাই আমি, ঊষার অরুণ
আর নীল বনরাজি দূরে।

দেশমাতৃকার আমি দরিদ্র সন্তান

দেশমাতৃকার আমি দরিদ্র সন্তান
দুঃখ আর শ্রমভারে ক্লান্ত জর্জরিত,
রোদে হিমে পোড় খায় আমার জীবন
ভাগ্যের দাসবৃত্তি অতি চিরাচরিত।

দম্ভে ভরা অশরীরী দিনের
নিরন্তর যত্নে আজ দেহ শ্রান্তিময়
নিজের কুটীরে তাই আশে বিশ্রামের,
রোগক্লিষ্ট আর হতাশ হৃদয়।

তবু মোর গোপন চিন্তায়
আমি যেন কোনো এক অতন্দ্র প্রহরী,
চরম দুর্দশার মাঝে বিশ্বময়
দেখি যেন ঝিকিমিকি মরীচিকাপুরী।

ছায়াপথ পিছে ফেলে যাই আমি উড়ে
ঘুমন্ত সাগর কতো হয়ে যাই পার
মায়াপাশে বন্দী আমি অচিন গ্রহের
অলৌকিক পুষ্পগন্ধে আমি যে বিভোর।

আর সেই স্বপ্ন-কোমল ছবিতে মিথ্যার
(যেন কোনো রূপকথা—কাহিনীর মতো)
দেখি তব নিঃসীম প্রান্তর,
মায়াবিনী গগনের সীমা গর্বোদ্ধত।

সোনালী হেমন্তে ঝরে সোনা-রং পাতা

সোনালী বসন্তে ঝরে সোনা-রং পাতা,
প্রতিটি শাখার অঙ্গে বর্ণাঢ্য বসন,
আমার আকাশ ছায় বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে
ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে মোর সিংহাসন।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরে কুয়াশার মাঝে
ঢাকে যেন স্বপ্নময় নিঃসঙ্গ আবরণে…
ক্লান্ত, ক্লান্ত আমি, ব্যর্থতার ব্যথা বড় বাজে!—
অভাগী মা আমার, তন্ত্রী কি রণে মনোবীণে?

অন্ধকার রাত কালো ছায়া ফেলে
ঘেরাটোপে ঢেকে দেয় স্বদেশের মাটি।
আমি আজ দিশাহারা দিগ্‌ভ্রান্ত বলে,
স্তব্ধ মোর দুর্নিবার পাখার ঝাপটি,
ভুলে গেছি দুঃসাহসী পথের নিশানা,
গৃহহীন, ছন্নছাড়া নিঃসঙ্গ জীবনে—
নিঃশব্দে নিখোঁজ হয় আঁধারে প্রেরণা!
অভাগী মা আমার, তন্ত্রী কি রণে মনোবীণে?

ঝড় বয় শন্ শন্ পপ্‌লার গাছে
শুকনো পাতার রাশি বৃন্তচ্যুত ঝরে;
নিরাভরণ তরুশাখা আড়ষ্ট লাজে
ভূচরে সমুদ্রচিল কেঁদে কেঁদে ফেরে
আর ধরিত্রীর বুকে বেদনার ভার
ঢেকে দেয় ভগবান স্বপ্নের নিঃসঙ্গ আবরণে…
গান গেয়ে কেউ প্রার্থনা জানায় অন্তরে আমার…
অভাগী মা আমার, তন্ত্রী কি রণে মনোবীণে?

সাবধানী

ধ্যানমগ্ন প্রাচীন শহরের আকাশ জুড়ে
কুয়াশা আর ধোঁয়া, কুয়াশা আর ধোঁয়ার নির্মোক···
আর বাতাস—গৃহহীন তীর্থযাত্রীর মতো—
শ্বেত স্বপ্নের চাঁদোয়া মেলে ধরে।

আমরা পথ চলি, উজ্জীবিত হয়ে ফের পথ চলি
জীবিত আর মৃত প্রাণে ভরা এ শহরের মাঝে—
দুঃসাহসী পথ ধরে' চলে যেতে যেতে
গড়ে তুলি, প্রভুত্ব করি, অবশেষে ধ্বংস করে ফেলি।

তাই প্রতিটি নূতন দিন আমাদের কাছে নূতন কানুন,
আর প্রত্যেক আহ্বান চূর্ণ করে এক একটি সিংহাসন
মদমত্ত অপরাধী পিশাচ দলের।

তাই প্রতিটি চরম পাপের বেদনার মাঝে
প্রতিটি বিলাপ আর উল্লাসের কম্পনেতে নাচে
পল্লবিত, প্রস্ফুটিত রূপ আসন্ন ঝড়ের।

হুস্তো স্মিরণেন্‌স্কি ॥ ১৮৯৮-১৯২৩ ॥

লাল ঘোড়সওয়ার

নূতন যুগের ভোরে, নূতন বাণীর মশাল হাতে ধরে'
আসছে জোয়ান ঘোড়সওয়ার, উন্নতশির, দ্রুত গতির বেগ,
মাথার 'পরে শিকার খোঁজে মাংস-লোলুপ হিংস্র বাজের মতো।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে গুলী-গোলা, প্রকম্পিত শব্দে চতুর্দিক।

জোর কদমে ছুটছে সওয়ার দল, দেহের সারা শক্তি করে' জড়ো।
লুটিয়ে পড়ে সৈন্য কোন এক—ভূপাতিত নিষ্প্রাণ তার দেহ,
মুহূর্তেক থমকে দাঁড়ায় ঘোড়া, ধায় আবার, পায়ে হাওয়ার বেগ
সওয়ার-দলের পথের চিহ্ন ধরে, সামিল হতে আবার তাদের মাঝে।

ফুলিয়ে কেশর চলছে ছুটে তারা, পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে চষা-ক্ষেত
ধূসর রং ধূলোর মেঘ জমে চলতি ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরে ক্ষুরে।
সারি সারি ঘোড়সওয়ারের দল, কালবোশেখী ঝঞ্ঝা তাদের সাথী,
স্বর্ণ আভা দ্যুতিতে দেয় ভরে আগুন-ঝরা ওই দিগন্ত দূরে।

ওই যে সেথায় ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে গর্জে ওঠে বন্দুকের নল
রক্তক্ষরা স্ফুলিঙ্গের রাশি তীব্র আঘাত হানে সওয়ার দলে
হঠাৎ যেন নির্মম ঝড় নামে, ঝন্‌ঝনা ইস্পাতে ইস্পাত,
ক্ষণকালেই লড়াই হয় শেষ, সওয়ার দল আবার ছুটে চলে।

পবন-গতি চলো সওয়ার দল, তোমাদেরই চলার গতিপথে
রঙীন আশার প্রদীপ জ্বেলে বুকে লক্ষ মানুষ চোখ ফিরিয়ে আছে।
বদ্ধমুষ্টি তুলে আকাশপানে সারা জগৎ জানায় আশীর্বাদ,
লক্ষ মনে জাগে শিহরণ শুনে তোমার বিজয় তূর্যনাদ।

প্রকম্পিত হোক না কেন ভয়ে, বিস্ময়ের আঘাত জর্জরিত,
অত্যাচারের ভিতের 'পরে গাঁথা অন্যায়ের হর্ম্যপ্রাসাদ যত।
আধ-খোলা ঐ সিংহদ্বারের পিছে আছে জানি আত্মগোপন করে
আঁকড়ে ধরে' মৃত কানুন যত অতীত আশার কঙ্কালের সার।

তুচ্ছ করে অগ্নিবৃষ্টি, অসির ঝলকানি, পবন-গতি চলো সওয়ার দল।
ভবিষ্যতের তুমি অগ্রদূত, হোক না কেন সুষমা তোমার অতি ভয়ঙ্কর।
জেগে-ওঠা ক্রীতদাসের দল, তরঙ্গ লাল প্রচণ্ড দুর্বার।
রুদ্রগতি বজ্রজ্বালা ঝড়ে ঘোষণা করো যাত্রা গর্বভর

শেষ দুর্গ পড়বে যবে ধ্বসে, লেলিহান অগ্নিশিখা মাঝে
যুগযুগান্তের প্রাসাদ অত্যাচারের ভস্মে যবে হবে পরিণত,
বাহন থেকে নেমে তখন সবে প্রণাম জানাও মাতা ধরিত্রীরে।
ন্যায়ের রাজ্য করো বিঘোষিত, সত্য আর প্রেমের যেথা জয়।

কয়লা-খাদের মজুর

নীচে, নীচে, আরো নীচে
নেমে যাও তাপহীন অতল গহ্বরে
অর্ধনগ্ন দেহগুলি যেথা হামাগুড়ি দেয়
কালো কালো দেয়ালের পাশে ;
লৌহদৃঢ় পেশীগুলি ফুলে ফুঁসে ওঠে,
প্রতিটি আঘাতে জাগে তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনি
নিকষ আঁধারে ঢাকা পাতাল-পুরীতে।
বিঘোষিত করে দাবি—চাই দিন সূর্যকরোজ্জ্বল,
বিশ্রামের অবকাশ, মুক্ত নীলাকাশ,
বাতাস আর উন্মুক্ত প্রান্তর।
নীচে, নীচে, আরো নীচে
নেমে যাও অতল গহ্বরে।

নেমে যাও, আরো নীচে আঁধার জঠরে
লোভাতুর মাতা ধরিত্রীর,
সগোত্রের মাঝখানে হও সম্মিলিত
স্নান করো অন্তহীন আঁধার সাগরে।
তোমার হাতের ম্রিয়মান আলোক-বর্তিকা
সেথায় জ্বলবে যেন উজ্জ্বল তারকা
একরাশি আলোক কিরণে
উদ্ভাসিত হবে এক নির্মম শ্রমের মন্দির।
কালো অবগুণ্ঠনে ঢাকা পাপের জগৎ
যেথায় প্রভেদ নাই দিন ও রাত্রির।
নীচে, নীচে, আরো নীচে
নেমে যাও অতল গহ্বরে।

সে প্পুরীতে অগণিত শতাব্দী ব্যেপিয়া
স্তরের উপর জমে পাথরের স্তর,
সংখ্যাতীত বিষণ্ণ এ স্তরের মেলা
চারিদিকে ভিড় করে আসে ;
বোনা হয়ে চলে যেন জীবনের তাঁতে
পুঞ্জীভূত আঁধারের প্রস্তর গালিচা
স্পর্শে তার অনুভূতি বেদনা-শীতল,
অন্তঃস্তলে আছে জানি তীব্র হুতাশন ;
আরো নীচে, কঠিন আঘাতে
খণ্ড খণ্ড করো, ভগ্ন করো, চূর্ণ করো,
ছিন্ন-ভিন্ন করো এই জমাট আঁধার
মুক্তি দাও লক্ষকোটি শৃঙ্খলিত প্রাণ !

সংগ্রামের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আগুনের মাঝে
ছুঁড়ে দাও আঁধারের বিশাল প্রস্তর
তারপর নিরীক্ষণ করো—
অন্ধকার, রুদ্ধশ্বাস ধূম্রজাল ভেদি
অগ্নিস্রোত হবে উৎসারিত।
রাশি রাশি রক্তবর্ণ ঢেউ,
যেন এক স্ফীত, মত্ত নদী
উদ্দাম বেগে গ্রাসে চতুর্দিক,
নব নব ঝলকে ঝলকে
উত্তাল হবে এ ধরা,
আদিগন্ত প্রজ্জ্বলিত হবে
স্ফুলিঙ্গের বারিধারা মাঝে !

গাভ্‌রোচের ক'টি ভাই

সর্বাঙ্গে তোমার দেখি ঘৃণার স্ফুরণ।
হে কলকাকলিত লাস্যময়ী নগরী,
অসংখ্য আলোর মালা তোমার ভূষণ
উৎসব সজ্জায় সাজা মর্ত্যের অপ্সরী।

অপরাজিতা রং-এ রাঙা প্রতিটি সন্ধ্যায়
তোমার দৃষ্টিতে ভাসে নিঃস্ব শিশুদল
নিষ্পাপ তাদের মুখে কাঠিন্য ঘনায়
অকালেই ঝরে' পড়া পত্রিকা কোমল।

শৈশবেই আজ তারা ভাগ্যের শিকার
জীবনের নিষ্পেষণে মেরুদণ্ডহীন
এখানে তাদের দেখ পথের আনাচে
চোখ-ঢাকা টুপি মাথে পরিচয়হীন।

তোমার ভাণ্ডার হতে কি দেবে তাদের—
—দাক্ষিণ্যে প্রশস্ত তুমি কিছু ভাগ্যবানে,
গাভ্‌রোচের গৃহহীন এ ক'টি শিশুকে
তারুণ্যেই কেন হানো ক্রূরতার বানে।

ঝলমলে, উদ্ভাসিত বিপণি সম্মুখে
চমকে, থমকে দাঁড়ায় জটলা তাদের,
কত ব্যথা জমে আছে তীব্র দুটি চোখে
ঝরে যেন পড়ে হায় যন্ত্রণা-সাগর।

পথিকের পথচলা বিরাম বিহীন
মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলায়
বিপণির কাচে-ঢাকা প্রাচুর্যের ঋণ
অসংখ্য আকাঙ্খা ভাসে একটি ভেলায়...

সর্বাঙ্গে তোমার দেখি ঘৃণার স্ফুরণ।
হে, কলকাকলিত লাস্যময়ী নগরী,
অসংখ্য আলোর মালা তোমার ভূষণ,
উৎসব সজ্জায় সাজা মর্ত্যের অপ্সরী।

দিন আসবে

নিকষ কালো, নির্মম এ রাত্রি,
এ রাত্রি মৃত্যু-হিম শীতল।
ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীর বুকে
উষ্ণ রক্তের নিস্তব্ধ ফোয়ারা।
ধোঁয়াচ্ছন্ন ধ্বংসস্তূপের মাঝে
চক্ষুহীন যুদ্ধ দানব
লোভের পতাকা আন্দোলিত করে,
আর জাগে অবিরাম অসির ঝংকার।
সূচীভেদ্য অন্ধকারের পর্দায়
ছায়া জাগে বিভীষিকাময়
কোন এক অতিকায় ক্রশ—
তার দিকে পায়ে পায়ে চলে
অগণিত মানুষের দল
ন্যুব্জ কাঁধে বয়ে ধ্বজা স্বর্ণদেবতার।
ঘন আরো হয় অন্ধকার
মানুষের দল আরো পড়ে নুয়ে
বুকে তৃষ্ণা বাতাসের
দুই চোখে আবেদন উজ্জ্বল আলোর।
একটি আকাঙ্খা, একটি আশার দীপ
জ্বলে উঠে নিভে যায়, তবু
তুচ্ছ করে অশ্রুজল, তুচ্ছ করে উৎপীড়ন
আর শীতল অন্ধকারের বিভীষিকা
একটি বলিষ্ঠ আওয়াজ জেগে ওঠে ঃ
এ রাত্রি ভোর হবে, ভোর হবে এ রাত্রি।

ঝড়ের মাঝে

অপেক্ষা করবো আমি সাথীদের উৎসবের দিন
আর তাদের পাখার বিশাল বিস্তার,
যখন হাজারো ললাটের শিয়রে
মৃত্যু-চিহ্ন এঁকে দেবে নিয়তি,
যখন বজ্রমানিকজ্বালা ঝড় এসে দেবে ডাক
তার সন্তানদের বিদ্রোহে সামিল হতে।

দুঃসহ বেদনভরা দিনের আবছায়ার ভিতর দিয়ে
দৈনন্দিন পরিশ্রমের কোলাহল পার হয়ে
আকাশে উদিত হবে শুকতারা,
আর জীর্ণ কুটীরগুলো থেকে তখন
বেরিয়ে পড়বে দলে দলে যোদ্ধা সংখ্যাহীন
স্পার্টাকাসের পায়ে-চলা উজ্জ্বল কঠিন পথে।

কাল অবধি ছিল যারা গভীর ঘুমে অচেতন,
সেই মহান জনতাকে দেখতে পাবো
যাদের আঙ্গিনায় দুঃখের চিরন্তন বাস,
যাদের রক্তহীন মুখে চির অভাবের ছায়া,
নোংরা ভাঙ্গা কাচের জানালায় যাদের
মৃত্যু বাড়িয়ে দেয় তার হিমশীতল হাত।

দেখবো আমি ক্রীতদাসদের দুর্বার অভিযান,
শুনবো আমি তাদের ক্রোধের বজ্র নির্ঘোষ
কাঁপিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা চৌমাথার মোড়,
ছড়িয়ে দেবে দিক থেকে দিগন্তে
শতাব্দীর জোয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা
নিষ্পেষিত মানুষের স্বপ্নের আবীর।

বাক্যহীন ফ্যাকাশে-মুখ নিঃসহায় সাথীদের সাথে
কাঁধে তুলে নেবো আমার কালো ক্রুশ,
রক্তাক্ত আঙ্গুলে হয়তো আমার বুকে লেখা হবে
সংগ্রামের অন্তিম দিন, হয়তো বা
মেশিনগানের গুলীতে ছিন্নভিন্ন হবে আমার মাথা,
আমার ঘুম।

আর তুমি, প্রিয় সঙ্গিনী আমার,—আমাকে
প্রবোধ দেবার ছলে, দৃঢ় পদক্ষেপে গেছ চলে
বসন্তদিনের সূর্যোদয়ের পথে।
চুম্বন এঁকে দেবো তোমার বর্ণালী পোষাকে
আর আমাদের প্রথম উৎসবের প্রভাতকে
স্বাগত জানাবো উষ্ণরক্তের প্রবালবিন্দু দিয়ে।

আমরা

সবাই আমরা সন্তান মাতা ধরিত্রীর,
বঞ্চিত আমরা তবু তাঁর মধুস্তন্যপানে
আর পৃথিবীর গোলকধাঁধাঁ পথে
আলোক-রশ্মীর বুকফাটা তৃষ্ণায় নিভে যাই অন্ধকারে
আমরা, নিঃস্ব সন্তানেরা এই মাতা ধরিত্রীর।

চারিদিকে আমাদের চাবুকের শন্‌শন্‌, কাঁধে ভারী জোয়াল
আর পীতাভ ধাতুর দাসত্বের আইন ;
অনটনের মাঝেই আসে বার্ধক্য, তারপর হারিয়ে যাই,
চোখের জলে আর রক্ত জল-করা ঘামে সিক্ত করি আমাদের আঙ্গিনা,
আমরা, নিঃস্ব মৃত্যুপথযাত্রী—জন্মেছিলাম যারা বাঁচবার জন্য।

আমরাই আবার অগ্নিতরঙ্গময় মহাসাগর,
আলোকোজ্জ্বল শিখরের পথে মহান যাত্রীদল,
আমাদের হৃদয়ের মাঝে স্পন্দিত সমগ্র জগৎ,
অশেষ জীবনীশক্তিতে সবল আমাদের বাহু,
কিন্তু তবু আমরা বেদনা-কাতর তরঙ্গের মহাসাগর।

আমরা সৃষ্টি করেছি পৃথিবীর সব প্রাচুর্য,
কিন্তু আমাদের প্রয়োজন পাথর-চাপা থাকে শীতল বুকে।
অলক্ষিত মৃত্যুর কালো পাখার ছায়ায়
কাঁটার মালা গলায় নিয়ে বাড়িয়ে দিই মাথা—
আমরা, চিরকালের সৃষ্টিকর্তা, আমরা ক্লান্ত সৈনিকের দল।

কিন্তু আসছে বিচারের দিন! পৃথিবীর আকাশ জুড়ে
জড়ো হয়েছে কালবৈশাখী মেঘ আর তার বজ্র আহ্বানে
এক হয়ে মিশে গেছে ঘৃণা আর ভালোবাসা,
ধরিত্রী-মা চমকে উঠছে নিজেই
পায়ে দলতে, ঝেড়ে ফেলতে পাপ আর লজ্জার বোঝা,

কেননা আজ সর্বহারার সংগ্রামী সারিতে
হুঙ্কার দিয়ে জেগে উঠছে বিদ্রোহী তরঙ্গ,
আমাদের পবিত্র ক্রোধ ফুটে ফেটে পড়ছে,
তার আওয়াজ সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে জাগছে নির্ঘোষ
"আমরাও সন্তান এই ধরিত্রী মাতার!"

ডোরা গাবে ॥ জন্ম-১৮৮৮—॥

একটু দঁাড়াও, সূর্য

একটু দাঁড়াও, সূর্য !
আমি যে প্রস্তুত নই
আগামী রাত্রির জন্য,
আমার দিন যে শেষ হয়নি এখনো।
চেতনার সাথে বোঝাপড়া এখনো যে বাকী
বিশ্রামের অবকাশ কোথায় এখন ?
এই তো সবে শিখেছি ভাষা
পাথর আর গাছের,
আমার দিনের সাজি এখনো অপূর্ণ
আহরণ বাকী আছে রাশি রাশি জ্ঞানের সম্ভার ;
আর তুমি চাও পড়ি ঢলে সুষুপ্তির কোলে।
ভিতোসার শিখর রাঙিয়ে
গ্রামে গ্রামে অস্ত-রশ্মির আবীর ছড়িয়ে
ধীর, শান্ত পদক্ষেপে চলে যেতে চাও
রাজসিক ভাবে, বিনিময়ে পড়ে রবে
মোহভরা অঙ্গীকার আগামী দিনের।
একটু দাঁড়াও, আমাকে সময় দাও।
উপলব্ধি করি। কি ক'রে ঘুমোনো যায়
অশান্ত এ পৃথিবীতে,
যখন জেগে থাকাই হলো চেতনা
আর চেতনা—দিন ?

একটু দাঁড়াও, সূর্য !

দ্বন্দ্ব

বেদনা আমার বিরামহীন বৃষ্টি
সারারাত শব্দের তাল তোলে জানালায়।
কখনো বা সে চাঁদের আলো,
রূপোলী বন্যার ঢল নামে আমার চুলে
আমার ঘুমের গভীরে পথ খুঁজে নিয়ে
স্বপ্নের জাল বোনে
অবশেষে চিহ্ন তার রেখে যায়
ফোঁটা ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুজলে।

কিন্তু যখন উষার আলো ফুটে ওঠে
খুলে দিই আমার জানালার পাল্লা দুটো
তখন সে বিলীন হয় আগন্তুক দিনের বুকে।
হে যৌবনোচ্ছল সূর্যময় দিন।
মাথার উপরে শুনে পাখার ঝাপটানি
অনুভব করি আমার নবোদ্গত পাখাদুটি।
একদল প্রাণোচ্ছল যুবক যুবতী
পায়ে হাঁটা পথে আমাকে ছাড়ায়,
তালে তালে ফেলি পা।
কখনো বা দৃষ্টি পড়ে শিশুর নির্মল চোখে
অবগাহন করি তার নীল স্নিগ্ধ জলে।

চুপি চুপি সন্ধ্যা ফিরে আসে
সাথে করে নিয়ে আসে বেদনার বোঝা,
একই রূপ তার। পরিবর্তনহীন।
উপলব্ধি করি। অসম্ভব এ জীবন
সূর্যহীন
অথবা বেদনাবিহীন…

অনমনীয়া

হে বিশাল নিখিল
আমার চিন্তাকে
তোমার অসীমতায় ব্যাপ্ত করার আহ্বানে
ভয়বিহ্বল আমি।
তোমার মাঝে বিন্দুমাত্র এক এ পৃথিবী
আর এ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত আমার ভালোবাসা
আমার ঘৃণা,
আমার শক্তি—
চাই না এসব ছড়িয়ে দিতে
তোমার অসীমে।

সমৃদ্ধ আমি তোমার দানে ;
তোমার মত মহান হবার স্বপ্ন,
তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের চাবি,
তোমাকে জানবার অদম্য তৃষা।
এখন সময় হলো। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে
ফিরিয়ে দিতে হবে সব-কিছু যা দিয়েছো তুমি !

সূর্যোদয় দেখি।
তাকিয়ে থাকি সূর্যাস্তের দিকে।
শাশ্বত তোমার রূপে অবগাহন করি
আর অপেক্ষা করি নিজের বিনাশ,
তবু, অনমনীয়া !

উৎসর্গ

(মহান অক্টোবরের প্রতি)

তোমার উদয়ের সাথে জন্মলাভ করেছি আবার,
এ আমার দ্বিতীয় জীবন।
তোমার ঝরণা থেকে গণ্ডূষ করেছি পান
করতে গান
তোমার সুরেলা কলতানের সাথে
মিলিয়ে গলা।

তুমি বলো ঃ চাই আমাদের পাখা—
আমি হলাম পাখা।
তুমি বলো ঃ চাই আমাদের হৃদয়—
আমি হলাম হৃদয়।
হাত চাই আমাদের—বলো তুমি—
তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে দিই আমার হাত দুখানি।
যখন বলো ঃ চাই সাহস, শক্তি, খুন,
সর্বস্ব তোমাকে করি সমর্পণ।

তখন তোমার স্বর ধীরে শুধায় আমাকে
নিজের জন্যে কি রেখেছো বাকী?
—রেখেছি নিজের জন্য আকাশের বিশাল দরজা,
অর্গল যার খুলে দিয়েছো তুমি!

এলিজাভেতা বাগ্রিয়ানা ।। জন্ম-১৮৯৩—।।

আমার সঙ্গীত

প্রার্থনা আমার, নাও তুলে তরণীতে তব হে কর্ণধার
মসীমাখা সাগরের বুকে চিরে চলেছে যে ছুটে
মুক্ত-পক্ষ সমুদ্রচিলের গতি ম্লান করে'
স্পর্শলোভে অন্ধকার আকাশের সীমা।

অসীম বারিধি মাঝে তীর হতে দূরে সঙ্গীহীন
লবণাক্ত জলকণা সিঞ্চিত করবে আমাদের মুখ
দখিনা বাতাসে ফুলে উঠবে পালের বুক
যাদু-কাঠির ছোঁয়া-লাগা তরীখানি চলবে ছুটে পাখায় ভর ক'রে।

তখন হে কর্ণধার, গলা ছেড়ে ধরবো একটি গান,
যে মাটিতে জনম আমার, সে মাটিরই গান
বিষণ্ণ মেঘের মতো যার নাম ছেয়ে আছে আমার আকাশ,
যে গান মধুর মতো মিঠে, যে গান ভোরের মতো তাজা।

মেয়েরা ফসল কাটে এই গান গেয়ে
বধূরা জলকে চলে মুখর এ গানে,
উৎসবে যায় শোনা এ গানের উচ্ছল রেশ
মায়েদের শোকের বিলাপ এ গানের সুরে…

এমনি একটি গান, অসহায়, অশ্রুভারে রুদ্ধকণ্ঠ যার,
যে গান শোনোনি আগে, এরপর-ও শুনবে না আর,
ভাগ্যের এমন নখাঘাত সহেনি আর কোনো জাতি
নিরন্ধ্র রাত্রির অন্ধকারে ছিল ডুবে যার ভাগ্যলিপি।

তুষারের অনড় স্তূপ তুচ্ছ ক'রে ফোটে বসন্তের ফুল
ছোট আমাদের সাগর, তবু কৃষ্ণ তার নাম,
নিঃসঙ্গ, নিথর গিরিশৃঙ্গ, তারো নাম কালো,
উর্বরা দেশের মাটি, সেও কালো বিষাদের ছায়ে।

প্রার্থনা আমার, নাও তুলে তরণীতে তব হে কর্ণধার
উত্তাল মসীকৃষ্ণ সাগরের বুকে ভয়শূন্য চলেছে যে ছুটে,
রচনা করবো পথ আকাশের অন্ধকার সীমানা ছাড়িয়ে
সমুদ্রচিলের গতি ম্লান ক'রে পৌঁছাবো আকাশে।

ভবিষ্যৎ

ধূসর রাস্তার গোলকধাঁধাঁ ভেদ ক'রে
ক্রন্দিত নভেম্বর দিনের বিলাপকে ছাপিয়ে
ইস্পাত আর পাথরে কবর দেওয়া শহরে পথে পথে
আমি তোমার আহ্বান শুনি—ব্যাকুল অধীর তোমার স্বর।

আমি দেখতে পাই তোমার চোখ—রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে
হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়েছো তুমি দৃষ্টিহীনের মতো,
অপরিচিত পদধ্বনি শোনার জন্য উদগ্রীব তোমার মন,
প্রতিটি পদক্ষেপ উচ্চগ্রামে প্রতিধ্বনিত হয় হৃদয়ে তোমার।

কুহেলিকার সুতোয় বাঁধা পড়েছে আমার আকাঙ্খা, আমার আত্মা।
ওরা আমাকে নিয়ে চলেছে কোন ভবিতব্যের পথপ্রান্তে।
পথ চলি আমি, প্রশ্ন নেই, উদ্বেগ নেই, চাইনা দেখতে
আগামী কাল কোথায় থাকবো আমি, অথবা ভবিষ্যতে।

আহ্বান

আমি এখানে তিনটে দরজার পিছনে বন্দী,
জানালাটাও মোটা শিকের গরাদ অঁাটা।
মন আমার খাঁচায় বন্দী মুক্ত-বিহঙ্গ—
নীল আকাশ আর অঢেল সূর্যালোকে যার ছিল বাসস্থান।

বাতাসে ভেসে আসে বসন্তের সৌরভ,
আহ্বানের ধ্বনি বাজে শব্দের তরঙ্গে,
মৃত্যুর অজানা অন্ধকারে আমার শিখা
জ্বলে উঠবার আগেই নিভে যাবে।

মরচে-পড়া চাবির গোছাকে চূর্ণ করো।
অন্ধকার গলিপথ দিয়েই যেতে দাও আমাকে।
অনেক—অনেকবার এ দুটি পাখায় ভর ক'রে
সীমাহীন শূন্যতা অতিক্রম করেছি আমি।

কম্পিত হৃদয় থেকে তখন নিঃসারিত হবে
আনন্দ-মুখর গান…
কিন্তু এই তিনটে দরজার পিছনে বন্দী
আমার অগ্নিবীণার আহ্বান শুনতে পাও কি তুমি?

আমার দেশ

আমার দিনের গতি
ধীরে ধীরে
হেলে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে।
প্রথম ঊষার আলো
আর দীপ্ত মধ্যদিন
ফেলে এসেছি অনেক দূরে।
দুঃসাহসী পথ-চলা
অচিরেই হবে শেষ
দূরে দিকচক্রবালে।

রসালো ফলের মতো
হৃদয় আমার আকণ্ঠ করেছে পান
তোমার সূর্যের আলো
তোমার শিশির,
মাধ্যাকর্ষণের টানে আজ
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এক ভূপাতিত হবে,
তারপর মিশে যাবে ধূলিকণা হয়ে
উর্বর মাটিতে।

শিহরিত তুমি আজ দ্বারপ্রান্তে নূতন ভোরের,
কোকিলের মধুকণ্ঠে
সময়ের সঠিক ঘোষণা
অরণ্যে তোমার।

না, বিশ্বাস নেই মোর কোনো কুসংস্কারে,
কোকিলের ডাকে হিসাব গণিনি আমি
জীবনের ক' বছর বাকী,
জানি আমি এ ডাক করছে ঘোষণা
আগমনী
অনুরাগে ভরা বসন্ত-দিনের।

কি উপহার মালা পরাবো তোমাকে
হে, আগামী বসন্ত-দিন ?
চাষ করি না, বীজ বুনিনা, ফসল কাটিনা আমি
না তো সূতা কাটি, তাঁত চালাই বা ইট গাঁথি,
যে রুটি খাই আমি,
যে বস্ত্র দিয়ে ঢেকে রাখি দেহ,
যে ঘরে রয়েছে আমার কোমল বিছানা,
সবি গড়া অন্য কোনো
আশীর্বাদী হাতে।
আমি শুধু পারি আমার হৃদয় দিয়ে
আমৃত্যু তোমাকে ভালোবাসতে,
আর কণ্ঠ মেলাতে
তোমার পাখীর সাথে ঊষার সঙ্গীতে,
কথা কইতে তোমার সাথে
অবিরাম
আর বসন্তের রং-এ রাঙা
তোমার বর্ণনা দিতে
সারা পৃথিবীকে।

উত্তরাধিকারিণী

প্রপিতামহের ছবি নেই আমার দেয়ালে
না আছে বংশের ঠিকুজি,
জানি না কি ছিল তাঁদের নির্দেশ
না তাঁদের মুখ, তাঁদের জীবন।

অনুভব করি তবু ধমনীতে উত্তাল
বংশগত ভবঘুরে রক্তের ধারা,
মাঝ রাতে চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নেয়,
প্রথম পাপের পথে নিয়ে যায় টেনে।

হয়তো আমার হরিণ-চোখ প্রপিতামহী
শালোয়ার আর পাগড়ীতে সেজে
মাঝরাতে ঘর ছেড়ে গিয়েছিল চলে
কোনো এক মনোহরণ বিদেশীর সাথে।

দুনাভ নদীতীরের বিশাল প্রান্তর
হয়তো মুখরিত হয়েছিল অশ্বক্ষুরের শব্দে,
উদ্দাম বাতাস বুঝি ত্রাণকর্তা হয়ে
পথচিহ্ন দিয়েছিল মুছে।

আমিও হয়তো তাই ভালোবাসি
আদিগন্ত উন্মুক্ত প্রান্তর,
চাবুকে চাবুকে ছুটে চলা তেজিয়ান ঘোড়া,
হাওয়ার তরঙ্গে ভাসা উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

হয়তো ভ্রান্ত আমি, দুষ্টা ব'লে ক্ষোভ নেই মনে,
হয়তো বা পথের মাঝে চিরতরে লোপ পেয়ে যাবো
তবু রেখো জেনে, মেয়ে আমি তোমারই
মাটি-মা'র ধমনীতে সংযুক্ত আমার নাড়ী।

গেওর্গ মিলেভ ॥ জন্ম ১৮৯৫—১৯২৫ ॥

সেপ্টেম্বর

শত শত বছরের দাসত্বের
ঘৃণার জঠরে
এ রাত্রি জন্ম দিল
রক্তবর্ণ ক্রোধের আগুন—
অপরূপ।

অন্ধকার কুয়াশার অতল গভীরে।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই
অস্পষ্ট উপত্যকার মাঝে
সমস্ত পাহাড়ে পাহাড়ে
জনহীন অরণ্যে
ক্ষুধার্ত প্রান্তরে—
পঙ্কিল বসতি থেকে
গ্রাম
শহর
খামার
বস্তি আর কুটীর থেকে,
কারখানা, গুদামঘর, ইষ্টিশন
গোলাবাড়ী
গোয়াল ঘর
যাঁতাকল আর
কারখানা থেকে :
সোজাপথে, ঘুরপথে

উঁচু পথে
গিরিশৃঙ্গ, গিরিখাত, বন্ধুর পার্বত্য পথে
ঝোপঝাড়
বেড়া ডিঙ্গিয়ে
সূর্যহীন ছায়াঢাকা পথে
হেমন্তে হলুদ ছোপ লাগা অরণ্যের পথে
পাথুরে রাস্তায়
খাল
বিল
মাঠ
বাগান
ধানক্ষেত
আঙ্গুর-ঝোপ
ভেড়ার খোঁয়াড়
কাঁটাগাছের বেড়া
পোড়া জড় ভরা মাঠ
বন, জঙ্গল
জলা পেরিয়ে :
ছিন্ন বস্ত্র
ধূলিমলিন
ক্লিষ্ট
ভ্রুকুটি চোখ
শ্রমভরে ক্ষীণকায়
রোদে হিমে ন্যুব্জদেহ
বিকলাঙ্গ
অঙ্গহীন
লোমষ
    কৃষ্ণকায়
    নগ্নপদ
কঠোর কর্কশ

সাদাসিধে
বন্য
ক্রোধের আগুনে
পোড়-খাওয়া
—গোলাপ নেই হাতে
নেই গান গাওয়া
ঢাক, ঢোল, বাজনা নেই
জগঝম্প, বাঁশী বা সানাই
খোল, কাঁসর, করতালি ঃ

পিঠে তাদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি
হাতে তাদের—চকমকে টুপির বদলে,
পাকা লাঠি,
কাঠের মুগুর
গাছ-ভাঙ্গা ডাল
গরু-তাড়ানো ছড়ি
গাঁইতি,
শাবল,
কুড়ুল
দা
আর সূর্যমুখী ফুল
—ছেলে-বুড়ো কুল—
সবাই এলো বড়ো বড়ো পা ফেলে
খোঁয়াড় ভাঙ্গা
ক্রোধান্ধ পশুর পাল
যেন অগণিত
ক্ষ্যাপা ষাঁড়
প্রচণ্ড চিৎকারে
কাঁপায় বাতাস
(পিছনে তাদের পাথুরে আকাশ)

ধেয়ে চলে
ছত্রছাড়া ঠেলে সব বাধা

বাঁধভাঙ্গা খরস্রোতা
অরোধ্য
ভয়ঙ্কর
মহান
জনতা !

২

শিখরে শিখরে আলোর স্পর্শে
রাত্রি খান্‌খান্‌ হ'লো।
সূর্যমুখীর দল
সূর্যের দিকে মুখ ফেরালো।
মেশিনগানের বজ্রনির্ঘোষে
ঘুম থেকে জেগে উঠলো উষা ঃ
দূরের
পাহাড়ের ঢাল থেকে
—আঘাতের পর আঘাত—
শুরু হ'লো তপ্ত শীসের বৃষ্টি,
কামানের মুখ
মত্ত হাতির মতো
গর্জে উঠলো...
চারিদিক ভয়ে প্রকম্পিত।
সূর্যমুখীর দল ধূলায় লুটালো।

৩

জনতার কণ্ঠস্বর ঃ
ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর।

শত সহস্র ছুরিকায়
বিদ্ধ
জনসাধারণ
দলিত
মথিত
দারিদ্রে আর ভিক্ষান্নে
লোপবুদ্ধি
ছিন্নস্নায়ু
চমকে তাকালো
নিজেদের জীবনের দিকে
তারপর বিদ্রোহ করলো
—আর নিজেদের রক্ত দিয়ে লিখলো
আমরা স্বাধীন!

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

সেপ্টেম্বর।

—জনতার কণ্ঠস্বর—
—ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর—
হে ঈশ্বর!
কর্কশ কালো হাতের
পুণ্য কাজকে আশীর্বাদ করো ঃ
শক্তি দাও
আমাদের বিস্ফোরণোন্মুখ হৃদয়ে।
তুমি তো চাওনা কেউ দাসবৃত্তি করে—
এবার—আমাদের কবরের নামে শপথ—
পুনর্জন্ম দেবো মানুষের
স্বাধীন মানুষের নূতন জগৎ।
সম্মুখে মৃত্যু—
তা হোক।

মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে
অদূরেই
ফুটে আছে
কংক্রীটে বাঁধানো সত্যের
পারিজাত ফুল
আমাদের—
জীবন্ত স্বপ্নের চিরন্তন ফাল্গুনের দিন।
বিশ্বাস করি, জানি, কামনা করি তাকে!
ঈশ্বর সহায়!

৪

সেপ্টেম্বর! সেপ্টেম্বর!
হে রক্তাক্ত মাস!
প্রগতির
আর নিষ্ঠুর অত্যাচারের।
মগলিঝ শহর ছিল প্রথম
প্লরানে
এবং } জাগোরা শহর
নূতন
চিরপান
লম
ফের্দিনান্দ
বেরকোভিৎসা
সারামভেই
মেদকোভেৎস
(সাথে তাদের বিশপ আন্দ্রেই)
—শহরে ও গ্রামে।

৫

জনতা বিদ্রোহ করলো

—মুষ্টিবদ্ধ হাতে

হাতুড়ি,

কালিঝুলি মাখা দেহ

কাস্তে হাতে খামারে ক্ষেতে,

হিমে বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে ঃ

গতরে খাটা মানুষ

সীমাহীন যাদের সহ্যশক্তি—

(তারা কেউ বিরাট প্রতিভা নয়

অথবা বিশেষজ্ঞ

বা ধর্মযাজক

বক্তা

মিলমালিক

হাওয়াইজাহাজ চালক

বিদ্যার সাগর

লেখক

সৈন্যাধ্যক্ষ

গণিকালয়ের ফুলবাবু

গানের ওস্তাদ

কলমপেশা কেরাণী

কিছুই নয়।)

তারা হ'লো

ক্ষেতমজুর

কারখানার শ্রমিক

পালিশহীন সাদাসিধে মানুষ

নিঃস্ব

অশিক্ষিত

পতিত

সমাজবিরোধী

গুণ্ডা বদমাশ
—জান্তব হিংস্রতা
শত সহস্র
মানুষ
জনতা ঃ
হাজার মতে তাদের বিশ্বাস
—অটুট বিশ্বাস জনতার প্রগতিতে,
হাজারো তাদের সঙ্কল্প
—অটুট সঙ্কল্প উজ্জ্বল জীবনে,
হাজার হাজার উদ্বেলিত হৃদয়
—জ্বলন্ত অগ্নিশিখা প্রতিটি হৃদয়ে,
হাজার হাজার কালো হাত
—দিগন্তের রক্তিম বৃত্তের পটে
প্রাণের জোয়ারে উর্ধ্বে তুলেছে ধরে
লাল
পতাকার সারি
উড়ছে
দুলছে
প্রচণ্ড ঝড়ে উত্তাল ঢেউয়ের দোলায়
হাজারো কালো মাথা ঃ
হাজার হাজার
মানুষ
জনতা।

৬

আকাশ আর সূর্যের দিকে পেট উলটিয়ে
ভেসে থাকা মরা মাছের মতো
পাহাড়ে পাহাড়ে
বিদ্যুতের চমকে জাগলো

—বাজ
সোজা এসে
আঘাত হানলো
বিশাল মহীরুহের মর্মস্থলে।
শিখরের পর শিখর
ছুটিয়ে দিল প্রতিধ্বনি
দ্রুত বার্তা নিয়ে
দূরে
পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে
উপত্যকার কোণে কোণে
পাথর-চাপা গহ্বরে
—জ্বলন্ত শয্যায়—
খাঁজে খাঁজে ঘুমিয়ে থাকে
রক্তচোষা বাদুর আর মাকড়শা।
গুহার মধ্যে
ড্রাগন আর অজগরের আবাস যেখানে,
পিশাচিনীর অন্ধকার কোটরে

— — আর সেই গর্জন
লীন হ'লো দূরের প্রতিধ্বনিতে :
ঝর্ণা
আর পাহাড়ী নদীর
ছন্দোময় কলতানে—
জ্বলে উঠলো পাতালপুরী
উন্মাদ বিস্ফোরণে।

৭

সুরু হলো বিয়োগান্ত নাটকের দৃশ্য!

৮

প্রথম সারির সবাই
রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটালো।
ঝাঁক ঝাঁক বুলেট
অভ্যর্থনা জানালো সেই বিশাল তরঙ্গকে।
পতাকার রাশি
বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো,
সারা পাহাড় জুড়ে বিস্ফোরণের ঝড়…
উর্ধ্বে
নিকটে দূরে শিখরগুলি
মানুষ ছেয়ে গেল
—অন্ধকারের জীবেরা
আত্মপ্রকাশ করলো ঃ
মাইনে করা সৈন্যদলের সারি
আর শকুনি-হিংস্র পুলিশ—
কণ্ঠে তাদের
"বিপন্ন জন্মভূমি"
চমৎকার ঃ
কিন্তু—কার জন্মভূমি ?
আর অন্যদিকে নিরলস
মেশিনগান আগুণ ছড়ায়...
প্রথম সারির সবাই
রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটায়।
দূরের উঁচু-নীচু টিলার আড়ালে
গর্জে উঠলো কামান।
কেঁপে উঠলো
শহর
গ্রাম
অগুন্তি প্রাণহীন দেহে
ছেয়ে গেল

পাহাড়
উপত্যকা
পথ——
খোলা তলোয়ার হাতে
চলল ছুটে
ঘোড়সওয়ার দল
বিপর্যস্ত চাষীদের মাঝে
—গুলী গোলার আঘাতে আঘাতে
মৃতপ্রায়,—
সন্ত্রাসে ছুটে চলা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য চাষীদের
ঘরে ঘরে বার করলো খুঁজে
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা,
বুকফাটা হাহাকারকে
পদদলিত করে
রক্তমাখা তলোয়ারের
নির্মম আঘাতে
দেহ থেকে ছিন্ন হলো মাথা…

৯

এলো সৈন্যদল।
গোলাফাটার বিকট আওয়াজে
সাহসীরও বুক হৃতবল!
মুষ্টিবদ্ধ অসহায় হাত
ছুড়ে দেয় আকাশের পানে।
নিষ্ঠুর ত্রাসের ছায়া হানে
প্রত্যেকের মুখে—
একটিই ভাষা তাদের চোখে
"যে যার
বাঁচাও প্রাণ"

প্রতিটি অলিতে গলিতে
রক্তলোভী শ্বাপদের দল
—পদাতিক
অশ্বারোহী
সঙ্গীন আর অসির মিছিল।
চারিদিকে দানবের
দামামা নির্ঘোষ
সন্ত্রাস।
—ছিন্নভিন্ন
বিক্ষিপ্ত লাল পতাকাগুলিকে ছাড়িয়ে
অনেক উঁচুতে ওঠে
আগুণের লেলিহান শিখা।

সেই চরম বিশৃঙ্খলার মাঝে
একাকী
অমিত সাহসী
বিশপ আন্দ্রেই
আবেগে উন্মাদপ্রায়
ঐতিহাসিক সেই কামান দিয়ে
দেগে চললো
গোলার পর গোলা…
অন্তিম মুহূর্তে
"রাখবো না শয়তানের শেষ"
চিৎকার ক'রে উঠলো
ক্রোধে মহান
আন্দ্রেই প্ররুত—
ঘোরালো সে কামানের মুখ
সর্বশেষ গোলা
পাঠালো সে সোজা
—দেবের মন্দিরে

মন্ত্রজপ করেছে যেখানে
এতদিন ধ'রে।

তারপর আত্মসমর্পণ।
"ফাঁসী কাঠে দেবে প্রাণ লাল পুরোহিত,
প্রয়োজন নেই ক্রুশ কিম্বা সমাধির।"
টেলিগ্রাফের থামে বাঁধা হ'লো তাকে
পাহারায় সশস্ত্র সেপাই।
সেনাপতি।
তৈরী
ফাঁসীর দড়ি।
সমস্ত পাহাড় জুড়ে
নামলো কালো মেঘের ছায়া।
আকাশ
ক্ষতবিক্ষত।
দাঁড়ালো সোজা হয়ে আন্দ্রেই বিশপ,
যেন এক জলে-ভেজা
রোদে পোড়া
মহীরুহ বিশাল,
শান্ত সমাহিত প্রস্তরের মতো—
বিষাদের ছায়া নেই,
স্মৃতির ঝলক নেই
—বুকে যীশুর ক্রুশ
দৃষ্টি নিবদ্ধ বহুদূরে…
—আসন্ন মৃত্যুপথ যাত্রীর চোখে
ভয়ের চিহ্ন দেখেছো কি সেপাই!
একটি প্রাণের
কতটুকু দাম?
আমেন!

একদলা থুথু
ছুড়ে দেয় জোরে।
তারপর ত্বরিতগতিতে
দড়ির ফাঁস চড়িয়ে দেয় নিজের গলায়
তাকায় না সুনীল আকাশে
—ঝুলে পড়ে—
দু দাঁতের মাঝে
জিভখানা বের হয়ে আসে ঃ
বিরাট
মহিমান্বিত,
অজেয়!

১০

অন্ধকার, তুফান আর কালো রাত্রির
একটানা রেশ
চললো সারা হেমন্ত জুড়ে।
প্রচণ্ড ঝড়ে আচ্ছন্ন হ'লো
মেঘে ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী
—অন্ধকারে আর বিদ্যুত ঝলকে,
ঝাঁক ঝাঁক কালো কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বরে।

রক্ত-জল-করা ঘাম
ঝরলো মাটিতে,
ভয়ে আর আতঙ্কে জড়োসড়ো হ'লো
প্রত্যেক গৃহকোণ।
অকথিত অত্যাচারে
ফেটে চৌচির হ'লো মহাকাশ।

১১

শুরু হ'লো
বীভৎস অধ্যায়।
প্রত্যেক মানুষের মনে
বেজে উঠলো বিপদ-সঙ্কেত
প্রচণ্ড ঝন্‌ঝনায়—
রাত্রি যেন নীচে নেমে এসে
সবাইকে কয়েদ করলো
অন্ধ, বন্ধ কারাগারে।
অন্ধকার কোণে কোণে
লুকিয়ে-থাকা মৃত্যু
আত্মপ্রকাশ করলো সহস্র ফনায়।
সমস্ত রাত জুড়ে
অলিতে গলিতে
দেয়ালের আনাচে কানাচে
ভীত আতঙ্কিত অগুন্তি হৃদয়ে
হানলো
কালকূট বিষের ছোবল
নামহীন গোপনীয়তার রাত্রি।
—গোপনে এবং প্রকাশ্যে।

মাঠ-ময়দান আবার রক্তে লাল।
আর্তনাদে ভরলো আকাশ,
বিখণ্ডিত মাথা ঝরলো
এখানে সেখানে।
শৃঙ্খলিত অসংখ্য মানুষ।
বন্দীশালা স্থানশূন্য।
সৈন্যদের ছাউনিতে
জেলখানার চৌকিতে চৌকিতে
একটানা গুলীর আওয়াজ।

দুয়ার অর্গলবদ্ধ।
মৃত্যুদূতের করাঘাত দরজায় দরজায়।
পুত্র পিস্তল হাতে
শয়ান রাস্তার মাঝে
অনন্ত শয্যায়।
পিতা ফাঁসীকাঠে ঝোলে।
ভগ্নী ধর্ষিতা।
গ্রাম গ্রাম থেকে
জড়ো ক'রে নিয়ে আসে চাষী
পেছনে সৈন্যদল ঃ
থমথমে কনভয়।
তাদের প্রাণের দাম বেশী নয়।
আসে নির্দেশ—দাঁড়াও!
"নিশানা নাও"—
রাইফেলে রাইফেলে ঐকতান
কু
ক্লক্‌স্
ক্লান—

"ফায়ার!"
—এক ঝাঁক গুলী।
পাঁচজোড়া মৃতদেহ
ঝুপ ঝুপ ঝরে পড়ে
মারিৎসার নিস্তরঙ্গ ঘোলা জলে।
বিষাদের নির্ঝরিণী
প্রাণহীন দেহগুলি।
ধীরে ধীরে বয়ে নিয়ে চলে
অদূরেই
জনহীন পথে পথে
চড়া সুরে একটানা বেজে চলে
সামরিক ব্যাণ্ড

"কুল্‌ কুল্‌ বহে চলে মারিৎসা…"
রক্তে রাঙ্গা…
মাঠে মাঠে
উঁচু উঁচু ঘাসের সাগরে
ডুবে যায় রক্তমাখা মাথা
ক্ষতবিক্ষত, সনাক্তের অতীত।
নিস্তব্ধ কুয়াশের মাঝে
দেখা দেয় কালো হাতে গড়া
ফাঁসীকাঠ।
অবিরাম চলে সেই ভীষণ মিছিল
কুঠারের নির্মম আঘাত
ছিন্ন করে দেহ।
জ্বলে ওঠা গ্রাম
মধ্য রাতে সূর্যকে আহ্বান জানায়।
বয়ে চলে রক্তনদী।
আগুনের শিখা লেলিহান
আকাশের সীমানা ছাড়িয়ে
স্পর্শ করে
দেবতার সিংহাসন।
পোড়া মাংসের বিকট দুর্গন্ধে
চারিদিক ভরপুর।
স্বর্গাবাসে
আতঙ্কিত দেবতার দল
একযোগে চিৎকার ক'রে ওঠে
—স্তব্ধ হোক!
ঝঞ্ঝা প্রশমিত হ'লো,
কোলাহল ধীরে ধীরে
থেমে গেল ঃ
নৈঃশব্দের শান্তি

বিরাজ করতে লাগলো
সারা দেশময়।
দেবতার ভোগের আহুতি।

১২

হে কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
শোনাও আবার
এ্যাকিলিসের বিধ্বংসী ক্রোধের কাহিনী···
পশু-শক্তির প্রতীক ছিল এ্যাকিলিস।
যুদ্ধদানব।
মহামহিম সম্রাট আগামেম্‌ননের
অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিল এ্যাকিলিস।
বুকে তার অগুন্তি পদকের শোভা।
শান্তি আর শৃঙ্খলা রক্ষার
দৃঢ় স্তম্ভ এক···

কিন্তু আজ
বিশ্বাস করিনা আর মহাবীরে
—দেশী বা বিদেশী।
অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হ'লো ট্রয়।
সে আগুনে দগ্ধ হ'লো—
প্রিয়াম ও হেকুবা
এ্যাকিলিস মত্ত তখন উৎসব আনন্দে···
—তার কাছে হেকুবার কোন দাম নেই—
বন্য তার কঠোর হৃদয়
পায়নি শুনতে
পবিত্র মায়ের কান্না,
ঝরে-পড়া রক্তকণা থেকে
সমুত্থিত

অগণিত সমাধির সারি।
—তার কাছে হেকুবার কোন দাম নেই—
মহাবীর এ্যাকিলিস।
এ্যাকিলিস মহিমামণ্ডিত।
ঐশ্বরিক কশা হাতে স্বর্গের প্রতিভূ।
এ্যাকিলিসও শেষ হবে
অভিশাপ আর ক্রোধের আগুণে।
—তাই হ'লো,
মৃত্যু তাকে নিল টেনে ভীষণ পতনে ঃ
হত্যাকারীর উপযুক্ত ঋণ পরিশোধ।
আগামেম্নন্ হত্যা করলো ইফিগেনকে
—তারপর নিজে হত হ'লো ঃ
ক্লিটেমেনেষ্ট্রার হাতে নিহত আগামেম্নন্
—তারপর তারও নিধন ঃ
ওরেষ্ট আর ইলেক্‌ট্রা মিলে হত্যা করলো
ক্লিটেমেনেষ্ট্রাকে
—তারাও মরলো…

একমাত্র রয়ে গেল
—যুগ যুগ ধরে পরিবর্তনহীন—
দিব্যদ্রষ্টা কাসাণ্ড্রা ঃ
ভবিষ্যদ্বাণী তার—প্রাপ্য শাস্তি পেতে হবে
—সব কিছু সত্য হবে।
দেবতার খুশীর খেয়াল,
প্রমোদের আয়োজন।
যুগ যুগান্তের
দেবতার রক্তের পিপাসা।
এক একটি প্রাণের বিনাশ
তাদের আমোদ বিলাস,
শোকের বিলাপ—পরিহাস।

মৃত্যু, হত্যা আর রক্তের পাথার !
আর কতো কাল,
কতোকাল আর ?

হে সর্বসংরক্ষণকারী ঈশ্বর জীয়াস
জুপিটার
আল্লা
ইন্দ্র
টট্
রাহ্
জেহোভা
সাভোত্ঃ
উত্তর দাও।
জ্বলন্ত গ্রামের
পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়াকে ছাপিয়ে
বেজেছে তোমার কানে
নিহতের আর্তনাদ,
জীবন্ত-দগ্ধ
অগণিত শহীদের
কঠোর জিজ্ঞাসা ঃ
—কে,
কে ভেঙ্গেছে আমাদের বিশ্বাস ?

উত্তর দাও !
নিরুত্তর কেন তুমি ?
জানো না কি ?
—আমাদের আছে জানা।
শুনে নাও ঃ
এক লাফে
পেঁছাবো আমরা সোজা স্বর্গদেশে ঃ
ঈশ্বর নিপাত যাক্ !

—গ্রেনেডে চূর্ণ করবো তোমার কলিজা,
ঝঞ্ঝা বেগে দখল করবো স্বর্গপুরী !

ঈশ্বর নিপাত যাক্ !

তখন সিংহাসন থেকে
টেনে নামিয়ে
তোমার মৃতদেহ ছুঁড়ে দেবো নীচে
জনহীন,
নক্ষত্রহীন,
লৌহ-কঠিন শূন্যতার মাঝে—

ঈশ্বর নিপাত যাক্ !

আকাশের অন্তহীন সেতু বেয়ে
বেঁধে দড়াদড়ি
টেনে আনবো নীচে
বিশাল পৃথিবীর বুকে
স্বর্গপুরী।
যত কিছু লিখে গেছে কবি, দার্শনিক
সব সত্য হবে।
—চাইনা ঈশ্বর, শাসকের নেই প্রয়োজন।

সেপ্টেম্বর হবে পরিণত বসন্তের মাসে।
মানব জীবন
অগ্রসর হবে এক চিরন্তন প্রগতির পথে
—উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে, সমৃদ্ধির রথে !
এ পৃথিবী হবে স্বর্গপুরী—
হবেই !

"মেঠো ঘাস" থেকে

অকালে পরিণত
জনারের বৃন্ত থেকে
সোনালী দানা পড়ছে ঝরে,
মাগো,
ওরা যাচ্ছে চ'লে—
(ওরা) আসবে না আর ফিরে।

দূরে,
যেথায়
সাঁঝের আঁধার মিলছে এসে রাতে,
আত্মগোপন ক'রে আছে হত্যাকারী
আগ্নেয়াস্ত্র হাতে।

তোমার
অবাধ্য, গর্বে উঁচু মাথা
দুটি ছেলে,
সোনালী
শণের মতো,
মাগো, মাটিতে পড়বে হেলে।

তারপর পার হবে
অনেক,
অনেক দিন আর রাত,
আর বৃথাই
তুমি মাগো,
ওদের পথের পানে করবে দৃষ্টিপাত।

বৃথাই তুমি
প্রতি গভীর রাতে
একলা রুদ্ধশ্বাস
শঙ্কায় থরোথরো
শুনবে কান পেতে
যখন বাঙ্ময় হয়ে উঠবে আনাচ-কানাচ।

যখন
অন্ধকার কার্নিশের নীচে
গৃহহীন ঝ'ড়ো বাতাস
জলে ভেজা ঠোঁট নেড়ে
বলবে ফিস্‌ফিসিয়ে
ব্যথাভরা করুণ ইতিহাস।

অকালে পরিণত
জনারের বৃন্ত থেকে
সোনালী দানা পড়ছে ঝরে।
মাগো,
ওদের তুমি বুকে নাও তুলে
(ওরা) আসবে না আর ফিরে।

ডুবুরি

১

আঁধার ঘেরা উইলো গাছের পিছে মৃত্যু হ'ল সোনালী দিনের,
গা-জুড়ানো ঢেউয়ের ঢলে ঢলে সন্ধ্যা এসে নামলো ধরার বুকে
আকাশ জুড়ে মেঘের গুরু গুরু ক্লান্ত হয়ে থামলো অবশেষে,
এবার সবার ঘুমের সময় হ'ল, তারার ঘড়ি বললো যেন হেঁকে !

নোঙর-ফেলা তরীখানি এখানেই কি থাকবে অচল হয়ে—
শ্যাওলা ঢাকা সারা দেহে' কালো কাদা মাখা ?
কালো রংয়ের কফিন যেন ভাসছে কালো জলে
দোলায় যেন আমাদের চিরনিদ্রার কোলে।

দড়িবাঁধা হাতে এ সন্ধ্যায় আবার
প্রত্যাশিত চোখে চাই আলো-ভরা জনপদের দিকে
ডাক যদি দেয় কোন অলক্ষিত স্বর
স্তব্ধতার ঘেরাটোপে ঢাকা এই নদীতট থেকে···

প্রশস্ত প্রশান্ত নদী মেলে ধরে ঝলমলে হাত
অপরূপ রংয়ের মেখলা সাজে জলতল রেখা—
কে গো, বলো, আজ রাতে, আহত ব্যথিত দেহে,
চ্যুত নক্ষত্রের মতো উড়ে যাবে সেথা ?

২

তার হাল্কা গোলাপী পাপড়ি
মেলে দেয় ঊষা
সিক্ত নদীতটে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে
সাদা, সাদা ধোঁয়া।

মায়েরা একটু থামো
আজ ভোরে, ব্যস্ততার মাঝে ;
জলের গভীর তলে আবছায়া নীলে
শান্ত ঘুমে অচেতন তারা।

দলে দলে জলপরী
সম্মিলিত যেন কোনো গোপন সঙ্কেতে
স্বচ্ছ বরফে দেয় ঢেকে
রক্তক্ষরা ক্ষতস্থানগুলি।

কোমল ঘাসের শয্যা পাতে,
ধীরে, ভক্তিভরে
বিক্ষত মাথাগুলি
জলমলমের প্রলেপে সাজায়।

শতাব্দীর আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে তারা,
শোক সঙ্গীতের বিলাপ ধ্বনিতে
বিশাল শবাধারখানি
সমাধিস্থ মৃত্তিকার তলে।

মায়েরা, একটু থামো, অন্তহীন
জানি তোমাদের ব্যথার সাগর ;
পবিত্র এ অতল গহ্বরে
লুকিয়ে রয়েছে মর্মান্তিক গোপন কাহিনী।

৩

উইলো গাছের পাতা আর কাঁটালতার মালা জড়ো করি,
গোপন প্রস্তুতি চলে দিনে জলে-ডোবা জাহাজের খোলে—
সন্ধ্যে হ'লে উর্ধ্বে তুলে-ধরি মর্চেপড়া পুরনো বর্শার সারি,
স্বপ্নের পক্ষীরাজের পিঠে জিন চড়াই সকলে।

আর নিঃশব্দে নদীগর্ভ জুড়ে সুদীর্ঘ পংক্তিতে
ধাওয়া করি অজানা উজ্জ্বল দেশের মরীচিকা
আমাদের হিমশীতল শ্যাওলা-সবুজ চোখের তারায়
জ্বলে পাণ্ডুর হলুদ চাঁদের নিরাশার শিখা।

মনে আছে সেই নীলাভ সকাল, গান আর সাহস,
গোলাপী আগুণের ফুলকির মাঝে লমের সংঘাত,
মনে আছে কোনো এক গ্রামের পিছনে চরম সংঘর্ষ
আর রক্তাক্ত পরাজয়ের ভয়ঙ্কর নেকড়ের দাঁত।

আহত ঝিনুক যেমন ধীরে যত্নভরে
সংরক্ষণ করে আপন সত্তার বুকের গহনে
মুক্তা-শুভ্র কণিকার মতো আমাদের আশার স্ফটিক
হৃদয়ের অন্তঃস্তলে ধ'রে রাখি পরম যতনে।

আপন কোটর ছেড়ে লোভাতুর নদীর মাছেরা
ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের তাড়া ক'রে ফেরে
জলে ভিজে ফুলে-ওঠা আমাদের দেহ
ছিন্নভিন্ন করে নিষ্ঠুর ঠোকরে ঠোকরে।

তারপর কোনো এক বসন্ত সন্ধ্যায়, যবে
নীল পাহাড়ের ফাঁকে হেসে উঠবে চাঁদের নিষ্কলঙ্ক মুখ,
নামহীন জেলেদের ঘরে উৎফুল্ল আনন্দে
খুঁজে পাবে তারা অমূল্য কণিকা অদ্ভুত।

মুহূর্তে'ই তাদের হৃদয় মুখরিত হবে আমাদের গানে
অদম্য জাগবে মনে সূর্য আর মুক্তির আকাঙ্খা,
রোদে-পোড়া ললাটে তাদের বিচ্ছুরিত হবে
কুঞ্চিত বলিরেখা মাঝে রক্তিম তারকা।

স্মৃতি

জাগরূক আমার স্মৃতিতে গোধূলি আর পল্লবিত শাখা
অপরাজিতা সন্ধ্যার গায়ে ঝুলে-থাকা সাদা ঝাড়বাতি,
ফেলে যাওয়া তোমার রেণুকা আমার সম্পদ
হে শ্যামাঙ্গিনী, দৈবাৎ আমার সম্মুখে শ্লথ তুমি করেছিলে গতি।

হয়তো বহুদিন আগে সবকিছু ভুলে গেছো তুমি
মধুর চুম্বন, গোধূলি সন্ধ্যা আর সাদা ঝাড়বাতি
ছোট্ট একটি বন্দী পাখীর মতো আমার হৃদয়
বেঁচে আছে বহুকাল, সম্বল তার রেণুকার রতি ।

আবার এসেছে ফিরে উত্তুরে হাওয়ার সাথে হাড়কাঁপা শীত,
উষ্ণ পরিবেশে পাখী প্রতিরাতে মুখরিত গানে—
বলে শুধু—কি করে চলবো আমি এতো পথ লোহার শিকল পায়ে
পৃথিবীর প্রতি কোণে কোণে তোমার সন্ধানে !

সাত সাগর তেরো নদী পারের দেশেও থাকো যদি তুমি
দৈত্য-দানা ঝড়-ঝঞ্ঝা তুচ্ছ ক'রে ঠিক আসবো আমি
যায় যাক্ আমার বাহু, আমার চোখ, আমার হৃদয়
প্রতিদানে পাই যদি কণামাত্র তোমার ভালোবাসা।

জানা নেই মোর, তোমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা বিনে
কি হ'তো আমার এই ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনের বাঁকে ;
আর এই নিষ্ফলা প্রান্তরে তুফান আর তুষারের মাঝে
কি ক'রেই বা অভ্যর্থনা জানাতাম ভোরের আলোকে !

ভাবনা

শুয়ে আছি অনন্তের উপত্যকা কোলে
আমার চিন্তার রাশি আছে পাশে শুয়ে,
পড়ে দেখে সবকিছু যতো চলি লিখে,
ভ্রূকুঞ্চিত চোখ তার, দেখতে পায় না ব'লে
যথেষ্ট স্পষ্টতা, কতো মহান কর্মে ভরা এ জীবন,
আর এ ছবি যেন ঘোলাটে স্বপ্নের মায়া
মহৎ কাব্যের কোন প্রতিচ্ছবি নেই, নেই কায়া,
নেই এতে সেই আনন্দের সুরের সিঞ্চন
মাঠ-ঘাট চরাচর যাতে ভরপুর ;
সুস্পষ্ট যায় না দেখা নূতন প্রগতি
হৃদয়ে যে তোলে ঐকতান ঝ'ড়ো ভাবনার !
পরাজয় এড়াবার তরে আবার দাঁড়াই উঠে,
নবজাত চিন্তা মোর চলে সাথে সাথে
বিশ্বপরিক্রমায় যাবো কল্পনার রথে।

অনাবিল আনন্দ অনেক পেয়েছি আমি
বহুরূপী জীবনের পথের দুধারে,
আমার চিন্তারা সব অঙ্গ ঢাকে নূতন বসনে
তাঁতে বোনা সাধারণ মানুষী ভাষার।

বিষণ্ণ বা প্রাণবন্ত, কতো গান
নেমে আসে বনপথে নীচে সমতলে
সাথে ক'রে নিয়ে আসে দূরের স্পন্দন
বাজের ডানার মতো গতির ঝংকার তুলে…

ক্ষান্ত হও চিন্তা মোর, জন্ম যার কোমল শয্যায়,
শতাব্দীর চিন্তাধারা ক'রো না অস্বীকার,
আসে যারা ধীর পায়ে পিছনে তোমার
নূতন চিন্তায় ভরা তাদেরো হৃদয়।
দেখ তাকে, পৃথিবীর বুক চিরে চিরে
জন্ম দেয় স্বাধীনতার সোনার ফসল,
লুটায় মৃতদেহ তার পর্বতে প্রান্তরে,
অমৃতলতার মূল যেন খুঁজে ফেরে।

পথের বাঁক

সময়ের পথের বাঁকে ক্ষণিক দাঁড়াও,
স্মরণ করো তোমার পাদুকার কথা—
বাঁশীর আওয়াজে ছড়িয়েছে কতো গানের সুর
শুনতে যাতে পায় ঝিমিয়ে থাকার দল।

ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া এ পৃথিবী,
ব্যথা আর লালসায় নূতন ক'রে মোড়া,
অবশেষে বলবে আমাদের ঃ এই যে নমস্কার!
তোমরাই তো ছড়িয়েছো বেদনার বীজ!

চালুনির সূক্ষ্ম ছিদ্রের ওপরে—পথের বাঁকে,
চোখে সবার আকাঙ্খার মায়াঞ্জন
দ্বন্দ্বে ভরা আত্মার জগতে
নক্ষত্র আর রাস্তার আলো বিশাল রূপ নেয়।

ইট গাঁথা চলছে এক উঁচু অট্টালিকার
সবাইকে তার কোলে আশ্রয় দিতে,
আর তুমি স্বপ্নঘোরে মাথা ঠুকে যাও
জীবনে উদ্দেশ্য তোমার প্রয়োজনহীন।

সময়ের পথের বাঁকে নাও ক্ষণিক বিশ্রাম
জীবনকে দেখ, প্রসারিত করো চোখ প্রান্তরের দিকে—
সব ব্যথা গলে গেছে জ্বলন্ত অঙ্গারে,
প্রেমের সূতো কেটে চলে টাকু অবিরাম।

বর্ম

অস্বচ্ছ চিন্তার পর্দায় আবরিত
তুচ্ছ ঘটনার সমারোহের অন্তরালে
মধুমাখা কথা আর অপরূপ শব্দে গড়া
বর্ম আমরা বয়ে বেড়াই সকলে।

বন্ধু, হয়তো তুমি প্রতারণা করছো আমায়
তবু আমার বিশ্বাস অটুট, ভালোবাসি ব'লে—
পাখীর মতো ব'সো এসে আমার কাঁধে
এসো আমরা বৃষ্টি আর হাওয়ার কথা বলি!

একজন যায় চ'লে অন্য কেউ পূর্ণ করে স্থান।
ফেনিল সুরার ধারায় ভ'রে ওঠে পিপে—
বিশপ আর হাজীর প্রার্থনার গম্ভীর সুরে
আমাদের বয়স গুণে চলে নক্ষত্রের রাশি।

পাথরের নুড়ির সাথে বছরেরা গড়াগড়ি দেয়,
সময়ের আঘাতে আঘাতে নির্মল মসৃণ—
গর্ভে নিয়ে চিন্তার ভ্রূণ, আমরা তেমনি
অন্তরের বহ্নিশিখার রাশ টেনে ধরি।

ঘরে যখন ফিরবো প্রবাস থেকে
উপার্জন-লোভে দাসত্ব করেছি যেখানে।
ছুঁড়ে দিও আমার হাতে একখণ্ড মহাজ্ঞান
প্রসাদের মতো তাকে মাথায় ঠেকাবো।

হঠাৎ ব্যবহারের আশায় যে সব চিন্তারা
সময়ের আশে-পাশে ভিড় করে থাকে—
দূরে ফেলে দাও, সমাধিস্থ হোক তারা
ঝঞ্ঝা-অধ্যুষিত জনহীন প্রান্তরের মাঝে।

জানালা

আমার ঘরের জানালায় পর্দা নেই,
যেমন দিনের আলো বাধাবন্ধহীন
তেমনি অন্দরে এসে প্রতিটি মানুষ
দেখে, এখানেও আছে স্তব্ধতার প্রশান্তি,
যদি তাকে করি অভ্যর্থনা ব্যথাভরা মনে
যেন পাই ক্ষমা, কেননা আমার অন্তরে
নিরানন্দ কোনো এক স্মৃতি সদা জাগরূক,
নিঃসন্দেহে, আমিও করেছি ভুল অনেক জীবনে,
আমার বাড়ীতে তবু, পাহাড়তলীর এ বাগানটিতে
অপেক্ষায় থাকি আমি শুভার্থী সাথীর
প্রাণে যারা নিয়ে আসে আনন্দের ধারা !
বেদনারা সব পুড়ে ছাই হোক জ্বলন্ত অঙ্গারে,
চিরন্তন প্রেমের বন্ধন শুধু থাকুক পাথেয়
সুদূরের স্বপ্নময় ভবিষ্যের পথে !

মারিয়া গ্রুবেশলিয়েভা ॥ ১৯০০-১৯৭০ ॥

ঝড়

ঝড় যখন দেরী ক'রে আসে
অনেক শুষ্ক আর নিষ্ফলা দিনের শেষে
সে আসে প্রচণ্ড নির্ঘোষে
বজ্র ও বিদ্যুতে
মহাশক্তি নিয়ে
শতায়ু অশথগাছ অসহায়
উপড়িয়ে ফেলে
ঢেলে দেয় অঝোর জলের ধারা ;
আর ধরিত্রীর অন্তঃস্তল
সুখস্পর্শ এ বৃষ্টিকে স্বাগত জানায়
যেমন জানায় নারী
তার দয়িতকে।
ঝড় যখন দেরী ক'রে আসে
সে তোলে ধ্বংসের তাণ্ডব—
তারপর সৃষ্টির প্রেরণা।
দারুণ গুমোট-ভরা ফ্যাকাশে আকাশ।
নীচে তার সূর্য ঝুলে আছে
যেন পোড়া জোয়ারের রুটি।

বাতাস কাঁপে শিহরণে, মৌমাছির মতো
রক্তে করে পান উষ্ণ কিরণ।

পৃথিবীর মাটি, আতঙ্ক আর আশঙ্কায় অন্তঃসত্বা
বহ্নিশিখা
প্রসবে
প্রস্তুত!
অসহ্য গুমোট!
অন্ধকূপের মতো!
এমনি ভয়ঙ্কর—গম্ভীর প্রশান্তি!
ঝড়ের আগে স্তব্ধতার মতো···
তাড়াতাড়ি এসো তুমি, হে বজ্রনিনাদ
মহাকাশ ভেঙ্গে করো খান্‌খান্‌ বিজয় উল্লাসে।
এস ঝড় তুমি সর্বশক্তি নিয়ে
ঝেড়ে ফেলে দাও যতো পচা-গলা পাতা
আর এই অসহ স্থবিরতা
সাগরও স্পর্শে যার বদ্ধ জলাশয়।
ধরাতে ছড়াক্‌ আজ আনন্দ স্পন্দন
গভীর দীঘির মতো আকাশ হোক উজ্জ্বল সুনীল,
আর এই সিক্ত কোমল কালো মাটি ফুঁড়ে
মাথা তুলুক
সবুজ দূর্বাদল,
গিরিপথ পার হ'য়ে আসে যে পথিক
সে যেন ঘুমাতে পারে কোমল প্রান্তরে,
আর পুরো বুক ভ'রে যেন
নিতে পারে
সতেজ বাতাস।
দূরের দিগন্ত পানে চেয়ে থেকে থেকে
তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলবে সে ঃ
—অপূর্ব সজীবতা এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে!

প্রথম রশ্মি

বরফ-গলা জলধারা কুলু কুলু বয়
গান গেয়ে বয়ে যায় নালায় নালায়।
রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে ছোট্ট এক মেয়ে
চেয়ে দেখে চড়াইয়ের ঝাঁক মত্ত খেলায়।

ঝাঁক বেঁধে আসে তারা, কিচিমিচি, ঝগড়ায় মাতে
ছড়ানো শস্যের মাঝে ঠুকরিয়ে চলে
উষ্ণতার ছোঁয়া লাগে তাদের শোণিতে
একমুঠো পাখীর হৃদয় চলে দ্রুত তালে।

মেয়েটির সবকিছু ভালো লাগে আজ,
যে ফুল মেলেছে চোখ সবেমাত্র কাল,
যে সূর্য পড়েছে আজ রুদ্রের সাজ
আঙ্গিনা ক'রেছে আলো উজ্জ্বল সকাল।

তারপর মেয়েটির নড়ে ওঠে হাত
চড়াইয়ের ঝাঁক ত্রাসে উড়ে যায় চলে,
রেখে যায় আঙ্গিনাতে পদরেখাপাত
একটিও শস্যকণা পড়ে নেই ফেলে যাওয়া ভুলে।

কামেন জিদারোভ ॥ ১৯০২— ॥

কারখানার গেটের সামনে একটি কথোপকথন

যখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে
নেমে যাই বোবা অতীতের অতল গহ্বরে,
চোখের পর্দায় জীবন্ত হ'য়ে ওঠে, মানুষের মতো,
একে একে শৈশবের তিক্ত স্মৃতি যতো।
তারি মাঝে ধীরে ধীরে জাগে এক পাশে
দীর্ঘকায়, ক্ষীণতনু, অসুস্থ বালক—
হাপরের মতো শ্বাস ফেলে, কাশে
আর অভিশাপ দেয় সারা দুনিয়াকে।

না, আমার নেই সুন্দর স্মৃতির সম্ভার,
আমার অতীত নয় ছন্দোময় কবিতায় ভরা,
মনে পড়ে ফেলে-আসা দিনগুলি দারিদ্র-কঠোর
যে বিষ করেছি পান, যখন কিশোর।
পারিনা, পারিনা আমি ভুলতে কখনো
একটি অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ, শুধু হাতে, হিমে,
হট্টগোলে লুপ্তপ্রায় এক কথোপকথন
কারখানা ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে দুজনে।

দেখা করতে গিয়েছিলাম বাবার সাথে
বলতে তাঁকে বয়স-ভারী স্বরে—
পড়াশুনো শেষ হলেই জ্বনে, উঠবে জ্বলে
সুখের প্রদীপখানি আমাদেরও ঘরে।
পেরিয়ে ফটক ঢুকতে যাবার আগেই
দ্বারবানদের হাতে পেলাম বাধা।
—দিচ্ছি ডেকে তোমার বাবাকে, থাকো এখানেই—
রুক্ষ স্বরে ধমকে দিলো সে, এ কোন্ গোলকধাঁধাঁ।

তীব্র বড়ো ছিল সে-বার শীত
রুগ্ন শরীর কাঁপছে ভেতর থেকে
হাত-পা চালাই রাখতে বজায় সম্বিৎ
গাছের শাখা তুষারে গেছে ঢেকে।

বাবা এলেন—কালি-ঝুলি মাখা
সাথে তার এলো যেন পুরো কারখানার জঞ্জাল,
দেখে তাকে ঘৃণা-বিষে জর্জরিত মন,
দুর্বার ক্রোধ, জোর ক'রে কাশি চেপে রাখি।
বরফে ঢাকা দেয়ালের ওপাশে
দেখা যাচ্ছিল না তার নীল চোখের তারা…
আর…হতাশার মাঝে একরাশ আশা নিয়ে
প্রতারণা করছিলাম নিজেদের—পিতা-পুত্র মিলে।
—ধেরৃধেরিয়ে লম্বা হচ্ছো কেন? শুনি কাশো খুব।
হয়নি তো কিছু?—কিছু নয়—জবাবেতে বলি।
তবু তার ভীত আর্ত স্বর:
থেকো সাবধানে! দেখছো তো কি দারুণ শীত…
তারপর…গরাদের ফাঁকে গলিয়ে দেন
দোমড়ানো একখানা নোট, আবার জিজ্ঞাসা:
—পড়াশুনো চলছে কেমন?—এড়িয়ে যাই আমি:
—ভালোই আছি—জবাব দিয়ে মাটিতে ঠুকি শীত-তাড়ানি পা।
—প'ড়ো মন দিয়ে! ভালো ক'রে পাশ করা চাই!
দেখছো তো কেমন আছি খাসা দেয়াল ঘেরা ইমারতে…
আস্তিনে চোখ মুছি আমি
বলি কোনক্রমে: দেখছি…ভালো ক'রেই জানি।
মুহূর্তেই অন্য প্রশ্ন এক:
—তোমাকে শুধাইনি আমি, তোমার তো দেখা পাওয়া ভার,
লেখাপড়া করো কেন…কি হ'তে চাও?

—হ'বো…বলি আমি, হয়তো বা…কবি।
পরিষ্কার বুঝি, আমার বোকামি নাড়া দেয় তাকে,
চেঁচিয়ে বলেন—হাওয়ার পেছনে ধাওয়া করছো তুমি…
তারপর যোগ করেন রূঢ়-কোমল স্বরে:
ঘানি টানছি…তুমি যাতে মানুষ হ'তে পারো!
নির্বাক তারপর…শুধাই আমি—কেমন আছো তুমি?
বলেন বাবা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে মাথা
—ভালোই আছি…থাকে কেমন গরীব আমার মতো…
দুজনেই তাকাই মাটির দিকে, হারিয়ে যাওয়া কিছু খোঁজার ছলে।
দুজনেই চুপ। পৃথক করা জানোয়ারের মতো
মানুষে তৈরী আঁধার-হিমের দেয়াল দিয়ে ঘেরা।
কান্না আমার চোখে, উপায় নেই কোনো
হাত মেলাবো বাবার সাথে সভ্য লোকের মতো,
—যাও এবারে! ঠাণ্ডা বড়ো! কঠোর নির্দেশ,
ভারী স্বরে তার ফুটে ওঠে দারুণ বেদনা।
চকিত চোখে বলি চুপি চুপি—বিদায়…
তারপর মুহূর্তেই মিশে যাই শীতের কুয়াশায়।

আমাকে বোঝেনি বাবা, বলি মনে মনে
জানেনা হয়তো সে 'কবি' শব্দের মানে।
এতদিন পরে বুঝি আমি অতি পরিষ্কার
সত্যি ছিল সেই রূঢ় উপদেশ তার।

ভয়ঙ্কর স্মৃতি সব ভিড় করে মনে
ফিরতে চাইনা আমি সেখানে—পিছনে।
ক্ষুধায় পীড়িত আমার তরুণ জীবনে
বহু বোঝাপড়া আছে বাকী পৃথিবীর সনে।

১৯৩৮

জল রং

আবার বসন্ত এলো, নৈঃশব্দ, এখনো ঘুমিয়ে আছে
ঝরে'পড়া মৃত পাতা তলে ঘাসের অঙ্কুর।
বাগানে শীতের হাওয়া ফেলে অন্তিম নিঃশ্বাস।
সমুদ্র নির্বাক। নগ্নদেহ এখনও ঋজু পপ্‌লার।

রঙীন আশারা তবু ভ'রে আছে কানায় কানায়
আমন্ত্রণের হাসি হাসে সাদা বালিয়াড়ি
আমার ব্যথার বরফ ধীরে গ'লে যায়—
নীরব বীণায় জাগে আবার ঝংকার।

আলো ফুটে ওঠে—উত্তুঙ্গ পর্বত শিখরে ব'সে
অপরূপ তুলি দিয়ে ঊষা এঁকে চলে
হিমে-ভেজা পাথরের গায়ে ফুলের বাহার
আর উত্তর মুখে উড়ে-চলা বলাকার সারি।

নির্মল আকাশ মুখরিত আহ্বানধ্বনিতে।
তারাগুলো মনে হয় পান্নার গুঁড়ো।
ভালোবাসা মোর অন্তহীন অজানার পথে
অসীম সাহস বুকে যেন দেয় পাড়ি।

আমার ব্যথাকে তখন ঠেলে দিই দূরে,
ভুলে যাই, বহুদিন হ'ল আমি হেমন্তের পথে।
আশার আকাঙ্খা রূপ নেয় নব কলেবরে
প্রাণখোলা গানে উড়ে চলি পাখীদের সাথে।

গ্রীষ্মের বর্ষা

বৃষ্টির শেষে সূর্য তার উষ্ণ হাতে
সজীব প্রকৃতিকে আদরে ভরায়।
শুভ্র হীরক স্ফটিকের মতো
জলকণা ঝলমল করে ঘাসের ডগায়।

অরণ্যে নবপত্রদলে রামধনু রং শিশিরের কণা,
সোনালী সূর্যাস্ত প্রান্তরের বুকে শিহরণ ঢালে।
বলাকার সারি মাতে কাকলির ঐকতানে
দুরন্ত পাখা স্নান করে আকাশের নীলে।

আমার মনেও জেগেছে আজ আনন্দ-জোয়ার
বুকে যেন সুত্রপাত হ'লো নবজীবনের,
ভেজা পথে পড়ে আছে পদচিহ্ন তার
যে তরুণী এই পথে নিয়ে গেছে রূপের সম্ভার।

নিকোলা ফুর্‌ণাজিয়েভ ।। ১৯০৩-১৯৬৮ ।।

বসন্ত বাতাস

তুমি আমার মা, আমার ধর্মকন্যা
পাগলপারা আগুনঝরা ফাগুন দিন।
আগল ভেঙ্গে জাগাও প্রাণের বন্যা
সিক্ত শাখা নাচে শ্রান্তিহীন।

পাগল আমি, ছোটাই ঘোড়া মাঠে
ধূসর গলিপথে আমি দ্রুতবেগে ধাই।
মোষকে বলি ফিসফিসিয়ে চরছে যারা গোঠে
তাদের প্রতি ভালোবাসার আমার অন্ত নাই।

বিরাম বিহীন ধরার গতিবেগে
নৃত্যে মাতে আগুনজ্বালা গ্রাম ;
চারা গাছের পাতায় শিহর জাগে
পাগলা হাওয়ার দস্যিপনা মাতিয়ে তোলে প্রাণ।

অবিশ্বাসী সান্ধ্য হাওয়ার তালে
হারায় মানুষ, কেউ বা দাঁড়ায় উঠে,
অসীম কোনো দুরন্ত খেয়ালে
প্রাণের ছোঁয়া লাগে পথে ঘাটে।

তুমি আমার মা, আমার ধর্মকন্যা
পাগলপারা আগুনঝরা ফাগুন দিন,
আগল ভেঙে জাগাও প্রাণের বন্যা
সিক্ত শাখা নাচে শ্রান্তিহীন।

ঘোড়সওয়ার

ঘোড়সওয়ার, ঘোড়সওয়ার, রক্তস্নাত ঘোড়সওয়ার,
প্রজ্জলিত আমার স্বদেশ, আমার জন্মভূমির আকাশ,
কোথায় জনতা, কোথা সেই বিদ্রোহী মাটি,
কোথায় আমরা, হে মোর বিষণ্ণ বিস্তীর্ণ দেশ ?

জ্বলে গেছে গ্রাম সেথা, ফাঁসিমঞ্চ শুধু গায় গান,
বাতাস থমকে দাঁড়ায় ঊষর ধূসর ক্ষেতে,
আসছে ঘোড়সওয়ার, প্রসূতি ধরার বেদনা রোদন,
কান্না যেন বিলাপের গান, মৃত্যু আসে মেতে।

তীক্ষ্ণ বর্শা মদমত্ত হাতে শূন্যে দেয় ছুঁড়ে,
ঝলমলিয়ে ওঠে সূর্যালোকে, রক্ত পড়ে ঝরে ;
বিশাল গগনতলে, জানালাগুলো উঠছে জ্বলে লাল
আকাশ যেন দেখছে মোদের রোষদৃষ্টিভরে।

ঘোড়সওয়ার, ঘোড়সওয়ার—অতলে গহ্বর প্রান্তে,—
আমার জন্মভূমি আর প্রজ্জ্বলিত দেশের আকাশ !
প্রলয় বাতাস আসে, মাগো, রোমাঞ্চ সুখে
গাও গান, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে লাগে মরণ পরশ।

এখনো পাগ্‌দণ্ডী, আঁকাবাঁকা পথ,
ভোর, উৎরাই নামার পথে শুনি
বন-তুলসী আর ঝাউবনের মাঝে
কাছেই কোথাও ছুটছে নির্ঝরিণী—
থমকে দাঁড়ায়, গর্জে ক্রোধে রুদ্ধগতি, যদি
বিশাল শিলা দাঁড়ায় সামনে এসে,
পথ ক'রে নেয় তবু আপন শক্তিবলে,
খুশীর গানে হেসে, ছোটে নিচের দেশে।

ঘূর্ণীতে পাক খেয়ে তার খরস্রোত
এগিয়ে চলে, পরক্ষণেই অবাক হবার পালা—
সফেন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন্ অতল তলে,
জলপ্রপাতে রৌদ্রালোকে ছড়ায় হীরের মালা,
শিলা দেহের সবুজ শ্যাওলা আনে চুরি ক'রে।
জড়ো করে ভেসে-আসা কালো পাতার রাশি,
ক্লান্ত কোনো শিশুর মতো বক্‌বকানি তার
চলছে অবিরাম। আমার কাছে স্পষ্ট তাহার হাসি।

প্রাঞ্জল আমার কাছে সকল কথা তার,
জানি আমি কি বলে সে যখন প্রবেশ করে
সমতলে ক্ষেতের মাঝে, যেথা নিরব হয়ে
শান্ত পায়ে পথ চলে সে, মুখে হাসি ঝরে
এদিক ওদিক চেয়ে দেখে পথের বাঁকে বাঁকে,
ভুলে গেছে ছেলেবেলার যতো দস্যিপনা
যৌবন তার ভ'রে ছিল পাগলামিতে কতো,
কতো লড়াই করেছে সে, না-মেনে কারো মানা।

ভালোবাসা

তোমাকে পড়ে না মনে।
ক্ষমা ক'রো মোরে।
তোমার নামও ভুলে গেছি আজ।
তবু তুমি আছো আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে,
ভালোবাসা আর স্নেহের প্রেরণা।
অসংখ্য শব্দের মেলা আসে ভিড় ক'রে,
তোমার অবয়ব যেন দীর্ঘকায়া ধ'রে
আমরণ রাখে ভ'রে আমার ভাবনা।
এক হ'য়ে মিলেছে নিয়তি
তোমার আমার, আর সেই পথ
যে পথে চলেছো তুমি শিখরের প্রতি।

কৈশোরেই দিয়েছিলে দেখা
বন্দী ক'রেছিলে আমার অশান্ত হৃদয়।
নিয়েছিলাম তুলে তোমার কোমল হাত,
আমার গণনাহীন দিন হয়েছিল তোমাতে বিলয়।

কতো স্বচ্ছ,
নিবিড় উজ্জ্বল
তোমার চোখ—
গভীর অতল!
দৃষ্টি তার চ'লে গেছে বহুদূরে

শতাব্দী ছাড়িয়ে,
সুতীব্র উজ্জ্বল—
কঠিন ও কোমল।
তার সেই সম্মোহনী দৃষ্টির গভীরে
হারিয়ে গেলাম আমি
দৃষ্টি তার
আগুন জ্বালালো শোণিতে আমার ;

ঝড়ের বেগ আনলো উদ্দাম যৌবনে।
নতুন ভোরের রংয়ে রাঙালো জীবন।
সেই মহান উদ্বেলতায় ভ'রে উঠলো
আমার মন
আমার সংবেদন,
যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি
গড়ে তুললো প্রেমের বিশাল প্রাসাদ।
মনে হ'লো তারপর যেন এ জীবন
হ'লো বিকশিত,
প্রবুদ্ধ
নূতন !
কঠিন অতি বর্ণনা করা
কেমন ক'রে তিলে তিলে বড়ো হ'লে তুমি,
এক মহান অনুভূতির প্রেরণায়
কখন বা তুমি শিখলে ভালোবাসতে
অথবা ঘৃণা করতে।
প্রচণ্ড ঈর্ষায় জ্বলে উঠি আমি
আর রূপকথার রাজপুত্তুরের মতো
রক্ত আমার টগবগিয়ে ফোটে
কোনো ঘৃণ্য চোখ
যখনি তাকায় তোমার চোখে...

হে প্রিয়তমা,
তোমার তো আছে জানা ঃ
ভালোবাসা আছে,
আছে অগাধ বিশ্বাস
ভ্রান্তিভরা আমাদের পৃথিবীতে !···
···আমার মুখের বলিরেখা মাঝে
দেখা পাব সময়ের নির্মম নিশান।

বার্ধক্য—
অপরিবর্তনীয়, অসহায়—
ধীর পায়ে উপস্থিত আমার দুয়ারে।
প্রতি পদে পদে
নিষ্ঠুর জীবন জর্জরিত করেছে আমারে।
তবু সেই উনিশের প্রেম
নির্মল নির্ঝরিণীর মতো আজো উৎসরিত।
প্রচণ্ড শক্তির আধার সেই ভালোবাসা !
উড্ডীন করেছে মোরে আকাশের নীলে
তার বিশাল ডানায়।
আমার চলার পথে দিয়েছিলে ফুল উপহার,
প্রয়োজনবোধে কখনো বা মধুর কঠোর।
আমার এই পবিত্র পাপের শাস্তি
অনেক সয়েছি আমি।
তবু মুহূর্তের তরে শোননি আমার স্বরে
অনুযোগ, বিকার
অথবা আর্তের চিৎকার।

তোমাকে পাবার জন্যে আগুনের স্রোত
পেরিয়েছি আমি,
ধরেছি বাজী সারা ভবিষ্যত,
তবু কঠিন বন্ধন তোমার
মুক্ত করা অসাধ্য আমার।

হে প্রিয়তমা,
তোমার তো আছে জানা
ভালোবাসা আছে,
আছে অগাধ বিশ্বাস,
ভ্রান্তিভরা আমাদের পৃথিবীতে।
যুদ্ধের হিংস্র ছায়া যবে
নিয়ে আসে ঘোর অন্ধকার,
নিজেকে শুধাই ঃ
কি ক'রে বাঁচবো আমি বিহনে তোমার,
কোন ভালোবাসা, কোন কুহক আশার।

আমার সমাধি

দেখি আমি নিজের সমাধি।
লোকালয় থেকে দূরে
ঢেকে-থাকা আগাছা জঙ্গলে।
স্মৃতির ফলক নেই, রবে অগোচরে—
চিরতরে কে শায়িত এই ভূমিতলে।

বৃষ্টি পড়বে ঝরে,
দগ্ধ হবে সূর্যের প্রখর কিরণে,
অরণ্যের মর্মরধ্বনি গান গেয়ে স্তব্ধ হবে শেষে।
আমি কি বিলীন হবো শীতল নিদ্রায়
জীবন যখন মাতে ফেনিল উচ্ছ্বাসে ?

জীবনে আমার জীবন্মৃত নই
মরনেও তাই
রাজী নই পরিণত হ'তে নিষ্প্রাণ ধূলিকণিকায়।
নিঃশ্বাসে আমার সে মাটিতে স্পন্দন জাগাতে চাই
কখনো বা উদার আহ্বানে, কখনো বা বিক্ষুব্ধ ব্যথায়।

কিছুকাল পরে
সেই সমাধিকে ঘিরে
গজাবে শ্যামল দূর্বা, হেসে উঠবে ফুল,
সেই ফুলের সৌরভ নিয়ে যাবে দূরে
নিমীলিত চোখে সমাহিত আকাঙ্খা-আকুল।

তারপর কোনো একদিন—
আসবে বসন্ত সেজে ফুলহারে—
আসবে সেথায় কোনো প্রেমিক যুগল।
আমারি ফুলে সাজাবে সে আপন প্রিয়ারে—
রাশি রাশি রামধনু ফুলে।

চোখে তাদের জ্বলে উঠবে প্রেম-বহ্নিশিখা
আর বাঁচার প্রেরণা,
সেই ক্ষণে
রুদ্র তেজে নবজন্ম পাবে আমার আকাঙ্খা,
আজীবন জ্বলেছি আমি যে তীব্র দাহনে।

আতানাস দালচেভ (১৯০৪—)

৪৪ আভেন্যু ছ্য মাইন (পারী)

কোন্ অশুভ যোগাযোগ টেনে এনেছে আমায়
এই দৃষ্টিহীন অন্ধকূপ আঙ্গিনায়।
দিন এখানে মধ্যাহ্নের আগেই নিঃশেষ
নেই হেথা সবুজের রেশ।

নির্বাপিত অগ্নিকুণ্ডের মতো
অদূরে স্টেশনের মাথায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
আমার জানালা চেয়ে থাকে দিনের পর দিন
কিন্তু হায়, দেখে না কিছুই ভেদ করে আঁধার কুহেলী।

তীব্র চিৎকারে আসে যায় ট্রেন
লাইনের বুকে অবিরাম শব্দের তরঙ্গ
বেহালার তারের মতো,—আমি যেন
বহু মাস ধরে' পথিক নিঃসঙ্গ।

তুষার

লোহা-গড়া শহরের কার্নিসে কার্নিসে
আর পীচঢালা এই রাজপথে
একবারও কি আসবে না নেমে
তুষার আকাশ থেকে শুভ্রদ্যুতি
পরীর মতো ? বিশ্বাস হয় না।
কয়লার মতো কালো এ শহরে
শুভ্র শীতঋতু, তাও হবে কালো।
এখানে চেনেনা কেউ পরী বা তুষারে।
কখনো বা আসে যদি নেমে—নির্দয়
নিষ্ঠুর ভাবে দলিত, মথিত হবে
সেপাই আর গণিকার জুতোর তলায়,
তার সাদা পাখ্‌নায় মেখে দেবে কালি
ষ্টেশন আর চিমনীর ধোঁয়া...

শুভ্র তুষার শুধু রবে বাগানের মাঝে
শিশুরা যেখানে খেলে সকালে ও সাঁঝে।

ইষ্টিশনে দেখা

ছোট্ট ইষ্টিশনে নেমে পড়লাম একা
পরের ট্রেন ধরার আশে,
অাঁধার যতো ছিল জমে খোলা মাঠের বুকে
জড়ো হ'লো আমার চারিপাশে।

স্তব্ধ নিথর চতুর্দিক, যাচ্ছে শোনা
ক্লান্ত সুরে ঝিঁঝিঁ-পোকার গান,
দূর থেকে আসছে ভেসে ব্যাঙের ঐকতান
কোথাও যেন পাম্প চলছে, শব্দ ম্রিয়মাণ।

আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম দাঁড়িয়ে অন্ধকারে--
কোনোদিন হয়নি দেখা চিরন্তনের সাথে.
ট্রেনের সময় এগিয়ে আসে ছোট্ট পায়ে ধীরে,
চিরন্তন, সে নিজেই এলো গেঁয়ো মাঠের পথে।

ধরলো খুলে ধোঁয়ায় ভরা নিজের অতল তল
তারি মাঝে গভীর রাতের কালোয়
দিলো ছুঁড়ে মুঠো মুঠো তারার আঙ্গুর ফল,
মন্ত্রে যেন ঝলমলিয়ে উঠলো হেসে আলোয়।

আমায় যেন ধরলো চেপে প্রবল নেশা ঘোর
কিন্তু তবু রক্তে আমার তীব্র অনুভূতি
অপরিসীম কোনো এক বিধ্বংসী ঘৃণার
তারায় ভরা মহাকাশের প্রতি।

রুদ্ধশ্বাস, তখন আমি ডেকে বলি তাকে ;
হে চিরন্তন, তোমার সাথে নেই তো পরিচয়,
ঊষর তোমার অসীমতার উচ্চ শিখরদেশে
একলা আমার স্থানটি বলো কোথায় ?

কেমন ক'রে পাবো তোমার অসীমতার মাঝে
স্পর্শ আমার ছোট্ট ঘরের ভিটে,
নিজের আমার যেটুকু বা আছে
আছে তা এই পাপে ভরা ক্ষুদ্র পৃথিবীতে।

ধরার মাঝে এই ক্ষণটিতে
আমার জন্যে ভাবছে অনেক মন,
প্রদীপখানি ঘিরে চারিপাশে
পথ চেয়ে আছে আপনজন।

ক্ষমা ক'রো, চুমকি আলোর রাতে
অগণিত তোমার তারার চেয়ে,
দেখি যদি আলোর রেখা একটি জানালাতে
যাবো আমি সেইদিকেতে ধেয়ে।

ম্লাদেন ইসায়েভ ॥ ১৯০৭— ॥

রাখাল বালক

ধেনুপাল নেমে আসে পাক্‌দণ্ডী পথে
তাদের পিছনে আসে রাত,
রাখাল বালক তার প্রাণখোলা গানে
পূর্ণ করে সন্ধ্যারক্তরাগ।

নীচে দুটি লৌহ সরীসৃপ
ছুটে চলে প্রান্তরের বুকে ;
দ্রুত ধায় খরস্রোতা নদী
গোধূলি আলোয় এঁকেবেঁকে।

রাখালের দৃষ্টি প'ড়ে থাকে
পর্বতের শিখর চূড়ায় ;
ভেসে আসে ধীর কণ্ঠস্বর
নিঃস্তব্ধ সন্ধ্যায়...

পর্বতের অন্যপাশে আছে
ভিন্ন এক দেশ সূর্যকরোজ্জ্বল—
আছে সেথা কণক গমের ক্ষেত
আর আছে হাসি প্রাণোচ্ছল।

অগম্য সাগরে সেথা
সন্ধ্যা স্নেহভরে
সূর্যকে করায় স্নান,
ডুবে সে কলঙ্কহীন ভোরে...

পার হ'য়ে যেতে চায় রাখাল বালক
নীলাভ পর্বত শিখর।
থমকে দাঁড়ায়, দেখে চেয়ে নিজ নগ্নপদ
হাওয়ায় উড়ায় ছিন্ন বাস তার...

আবার সে গান ধরে পাহাড় চূড়ায়,
সুর তার মনে হয় যেন কান্নার।
রাত আসে তার সাথীদের নিয়ে—
হিম, তারা আর গহন অঁাধার।

হে সময়, তুমি যেন বজ্রের নির্ঘোষে
ডুবিয়ে দিয়েছো সেই গান।
পর্বত শিখরে সেই রাখাল বালক
আমি সেই রাখাল বালক ছিলাম।
১৯৩৮

স্বপ্ন

পড়ে আছি হত, আমার আততায়ী,
যে রাতে নিহত আমি, তার থেকে কালো।
বারুদ-ঠাসা আকাশ ঝুলে আছে মাথার উপরে,
কাছেই কোথাও ক্ষুধার্ত নেকড়ের গর্জন।

পড়ে আছি গুলি-বেঁধা বুকে, একা,
বুনো ঘাস, কাঁটা ঝোপ, আগাছার মাঝে।
কে তবু ধীর পায়ে আসে মোর কাছে,
জাগ্রত ক'রে তোলে এই অসীম অ াঁধার ?

রাত্রি গভীর, আকাশে নেই একটিও তারা।
মা'র ঠোঁট তবু চুম্বন এ ঁকে বলে :
"মুক্তি যুদ্ধে দেছে প্রাণ মোর বাছাধন—
ঘুমা, ঘুমারে তুই, আমার এ কোলে।"

কে সে ? হয়তো বা হাওয়া
পাহাড়ের কোণ থেকে এসেছে যে ছুটে,
হয়তো বা বুনো ঘাস
আমার মাথার 'পরে বাতাসেতে দোলে···

শুয়ে আছি আমি অনন্তশয্যায়, একা,
বুনো ঘাস, কাঁটা ঝোপ, আগাছার মাঝে।
নিঃশ্বাস নিই না আমি, দেহ হিম, বৃথাই হেথায়
মা আমার অপেক্ষায় আছে ফিরে যাবো ব'লে...

১৯৪২

উচ্চতা

অপরিচিত আমার কাছে সমস্ত আঁধার,
আলোকোজ্জ্বল তীরে আমার স্বদেশ,
আদিম নরের মতো পূজো করি সূর্যের,
অমেয় উচ্চতার সিংহাসনে যে আছে আসীন।

খুশী আমি আমার এ তীরের পৃথিবীতে,
তার প্রাণ-মাতানো মাটির কাছের গানে,
তার ছায়াপথের
অসীম গভীরতা
পরিপূর্ণ অজানার রোমাঞ্চে।

আমাদের পৃথিবীর পক্ষীকূল
সূর্যেতে পৌঁছতে পারেনি আজো,
কিন্তু মানুষ
প্রবেশ করবে,
যেন নিজগৃহে,
নক্ষত্রের দেশে—

অপরিচিত আমার কাছে সমস্ত আঁধার।
ভীত নই বৃন্তচ্যুত হ'তে রোষাগ্নি বাতাসে;
সন্ধান ক'রে যাবো তবু
নির্মল মহাকাশ
হৃদয়ের ঘন নীল অতল গহ্বরে।

আমার দুশ্চিন্তা

তোমার ভবিতব্য আমার নিদ্রার দুঃস্বপ্ন,
হে আমার সুন্দরী বিষণ্ণ পৃথিবী।

এ গ্রহের বুকে মুখ-ঢাকা গহ্বরের সারি দেখে
জেগে উঠি, গর্ভে তাদের নরকের ভ্রূণ।
দেখি বর্মাবৃত শকুনের ঝাঁক
উত্তাল আটলান্টিকের আকাশে,
অকাল সূর্যাস্ত, রক্তঝরা আগুনের মাঝে
আর তোমার বুকের দিকে তাক-করা কৃপাণ।

তোমার প্রশান্ত পৃথিবীতে জ্বলছে এখনো
কতো শহর আর দেশ,
আততায়ী তার কালো শকুনের ঝাঁক নিয়ে
দিনরাত পাক খায় মাথার উপরে…
তোমার ভবিষ্যতের মাথায় দোলে ধ্বংসের ছায়া,
শোনা যায় লোহার নালের ভীষণ ঝঞ্ঝনা;
তবু ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে
নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে হবে তাকে পাতালপুরীতে।
বাজপাখী আজ তোমার প্রহরী
উজ্জ্বল ধাতুতে গড়া ভারী বর্মে ঢাকা
প্রজ্ঞা আর অকুতোভয় অদম্য সাহস,
সাথী তার আমাদের মানবিক অধিকার।

* * *

হে হৃদয়
তুমি আমার রাডার হও।

উদ্দাম হাওয়া ভেদ ক'রে দেখতে চাই
কি ভাবে এই তারাহীন রাতে
বিনিদ্র পৃথিবী
অস্বস্তিতে ছটফট করে।

উড়ে আসে
দূরের পলিগন থেকে
ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান।
বারুদ-ঠাসা দিগন্তে
দুই শত্রুশক্তি মুখোমুখি।

জ্বলছে
ভয়ঙ্কর নাপাম আগুনে
শিশু, ধানের গোলা, গাছ।
বুদ্ধ সেখানে মন্দিরে নিদ্রাগত,
বাইরে পুরুষেরা ব্যস্ত
রক্তপাতে...

হৃদয়
তুমি আমার বিবেক হও,
নিয়ে চলো লড়ছে যেখানে তরুণ সৈনিক।
চেয়ে দেখ, এই তারাহীন রাতে
ধিকি ধিকি এখনো জ্বলছে
ব্যারিকেড...

* * *

ব'সে ব'সে
ঈথারের তরঙ্গে শুনি
রাত্রির আতঙ্কিত স্বর।
প্রলয়ের বিদ্যুত ঝলক
খান খান করে মহাকাশ।

সমাগত অশুভ ইঙ্গিতে
পৃথিবীর বুক কাঁপে থরোথরো।
প্রশস্ত ললাটে তার
আঘাত হানে
একশো মেগাটন রকেট।

সাবাস ছেলেরা সতর্ক সজাগ,
প্রতিটি স্ফুলিঙ্গ তারা নেভাতে প্রস্তুত।
তবু ধ্বংসের হাত থেকে কে তাদের বাঁচাবে ?—
হে মহাকাশ
তোমাকে জিজ্ঞাসা…

ব'সে ব'সে
নৈঃশব্দের মাঝে শুনি
ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।
কি করে ছেলেদের বলি ঃ
ঘুমাও বাছারা,
শুভরাত্রি ?

* * *

জঙ্গলের মাথায় দাঁতে দাঁত ঘষে
দৈত্য
দুপাশে ছড়িয়ে দিয়ে ডানা।
নীচে এক-নদী রক্তের মাঝে ভাসে
গুলি-বেঁধা শিশু।

হিংস্র প্রতিহিংসায় ভরা
গ্রীষ্মমণ্ডলের রাত।
পীতাভ চাঁদের কলা ছুরি হানে

সবুজ টিলার বুকে।
শিশুটি নিরবে
হিম হ'য়ে আসে
চাঁদের আলোয় ভেসে,
মনে হয় আমার ঘরেই
শুয়ে আছে সে…

আর আমি তার দেহের প্রহরায়
একা ব্যথায় চিৎকার করি,
অভিশাপ দিই ক্রোধে আর লজ্জায়
হত্যাকারীকে…

* * *

বাজছে কোথাও বেথোভেন।
জলপ্রপাতের কলনাদ শুনি
প্রচণ্ড, প্রচণ্ড, মহাবলশালী
তরুণ বাতাসে গড়া
ঝড়ের মতো।
মেঘ ফেটে চৌচির হয় বিদ্যুত ঝলকে।
তারপর—বজ্রপাত, অবশেষে স্তব্ধতা নামে।
মহাশূন্য ভরে ওঠে স্নাত-পূত
তারার মালায়…
মুগ্ধ হ'য়ে বেথোভেন শুনি।
কিন্তু হঠাৎ কেন
গোলাবৃষ্টি ঝরে' পড়ে
শীসের আকাশ থেকে?
জঙ্গলের মাঝে,
প্রান্তরে প্রান্তরে,
জানি এই মুহূর্তেই কেউ মরছে গুলিতে।
সব কিছু ম্লান করে তবু জাগে তার বাণী
গুলিতে স্তব্ধ হয় না যে কণ্ঠস্বর।

নিকোলা ভাপৎসারোভ ॥ ১৯০৯-১৯৪২ ॥

বিশ্বাস

এই তো—আমি নিশ্বাস নিই
কাজ করি
বেঁচে আছি
আর কবিতা লিখি
(যেমনটি পারি)।
জীবন আর আমি
কঠিন ভ্রূকুটি চোখে মুখোমুখি,
লড়ি তার সাথে
আপ্রাণ শক্তিতে।

পাঞ্জা লড়ছি আমি জীবনের সাথে,
কিন্তু ধ'রে নিয়োনা যেন
জীবনকে ঘৃণা করি।
ভুল, ঠিক বিপরীত।—
মরণেও
বার বার চাইবো আমি
জীবন তার
কর্কশ কঠিন আলিঙ্গনে
জড়াক আমাকে।

ধরো, এই মুহূর্তে
ফাঁসির দড়ি গলিয়ে দিয়ে
প্রশ্ন করে ঃ
"বাঁচতে চাও কি একদণ্ড আরো ?"
তক্ষুণি চিৎকার করে বলবো

"খুলে দাও!
খুলে দাও!
এক্ষুণি খুলে দাও দড়ি,
শয়তান!"

জীবনের জন্য
সবকিছু করতে প্রস্তুত।
উড়ে যেতে রাজী আছি
পরীক্ষার বিমানযন্ত্রে।
প্রবল গর্জন রকেটের অভ্যন্তরে
আমি যেতে রাজী, একা
খুঁজে বেড়াতে
মহাকাশে সুদূরের গ্রহ-তারা।

তবুও লাগবে মনে
খুশীর আমেজ
দেখবো যখন মাথার উপরে
ঘন নীলাকাশ।
তবুও লাগবে মনে
খুশির আমেজ
বেঁচে থাকতে,
নিজের অস্তিত্বের আনন্দে।

কিন্তু ধরো,
তুমি নিতে চাও—কতটুকু?
কণামাত্র আমার বিশ্বাস,
গর্জন ক'রে উঠবো
বুকে ক্ষত চিতার মতো,
বেদনার তীব্র আর্তনাদে।

কি আর থাকবে বাকী
তখন আমার ?—
লুণ্ঠনের মুহূর্তে'ই
নিঃস্ব হবো আমি।
আরো সোজাসুজি
খোলাখুলি বলি—
লুণ্ঠনের মুহূর্তে'ই
হবো শূন্যে পরিণত।

হয়তো টুকরো ক'রে
ভেঙ্গে দিতে চাও
আমার বিশ্বাস
আগামী সুদিনে।
বিশ্বাস আমার
এ রাতের ভোরে
জীবন সুখের হবে,
জীবন সুন্দর ?

কি ক'রে চূর্ণ করবে আমার বিশ্বাস ?
বুলেটে ওড়াবে ?
অর্থহীন
বৃথাই খরচ হবে গুলি!
হৃদয়ের অন্তঃস্তলে
অভেদ্য বর্মে ঢাকা বিশ্বাস আমার,
এ বর্মভেদী বুলেট
এখনো তৈরী হয়নি,
তৈরী হয়নি আজো!

চিঠি

তোমার কি মনে পড়ে
সেই সমুদ্র আর যন্ত্রের ঘর্ঘর,
আঠার মতো অন্ধকারে ভরা
জাহাজের খোল ?
আর সেই বন্য আকাঙ্খা—
ফিলিপাইন
আর ফামাগুস্তার মাথার উপরে
টসটসে তারার উদ্দেশে ?
তোমার কি মনে পড়ে কোনো জাহাজীকে
তৃষ্ণার্ত নয়নে যে তাকায়নি দূরে
যেখানে নিভে আসা দিনের আলোয়
গ্রীষ্মমণ্ডলের হাওয়া লাগতো মুখে ?
তোমার কি মনে পড়ে, কি ক'রে
ধীরে ধীরে
হিম হ'য়ে এলো আমাদের শেষ আশাগুলি
হারিয়ে গেল বিশ্বাস—
সদ্‌গুণে
আর মনুষ্যত্বে,
রোমাঞ্চে
আর
আকাশকুসুমে ?
তোমার কি মনে পড়ে, কেমন যেন
খুব তাড়াতাড়ি
আটকে গেলাম আমরা জীবনের ফাঁদে ?
বুঝেছিলাম।
দেরীতে।
ততক্ষণে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।
খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মতো

চকচকে
তৃষ্ণার্ত চোখে
দয়া-ভিক্ষার
কাতর প্রার্থনা।
আমরা তখন ছেলেমানুষ ছিলাম,
বড়ো ছেলেমানুষ ছিলাম আমরা।…
আর তারপর…তারপর
এক তীব্র ঘৃণা
ছড়িয়ে গেল হৃদয়-গভীরে
দুষ্ট ক্ষতের মতো,
না, না, কুষ্ঠের মতো,
বেড়ে গিয়ে
বিকল করলো মন,
বুনে চললো সে তার নিষ্ঠুর জাল
শূন্যতার
আর অন্ধ হতাশার,
রক্তের কণায় কণায়
বিপদ সংকেত।
তখন আমাদের বয়স ছিল কম, বড়ো কম।

বাইরে—
ঊর্ধ্বে আকাশে,
তেমনি চমৎকার
সমুদ্রচিলের ডানা কেঁপে কেঁপে ফেরে,
আকাশ তেমনি উজ্জ্বল
অভ্রের মতো,
মহাশূন্য তেমনি
অসীম সুনীল,
তেমনি ধীরে ধীরে
দিগন্তে অদৃশ্য হ'ত পাল

আর মাস্তুলগুলি হারিয়ে যেত দূরে।
কিন্তু ততদিনে আমরা দৃষ্টিশক্তিহীন,
আমার কাছে এ সবই অতীত, প্রয়োজনহীন।
কিন্তু আমরা ছিলাম একই খড়ের বিছানার শরিক,
তাই তোমাকে না ব'লে পারি না
কি দৃঢ় বিশ্বাসে বলীয়ান আমি।
এ সেই নূতন কিছু, যা আমাকে প্রবৃত্ত ক'রেছে
আমার
অন্ধত্ব
ঘোচাতে।
অন্তরের তীব্র জ্বালা
পরিণত করেছে সে
কঠিন সংগ্রামে,
যার আহ্বান
আজ
চতুর্দিকে।
এ সংগ্রামই আবার ফেরাবে ফিলিপাইন
আর ফামাগুস্তার মাথার উপরে
টসটসে তারার ঝাঁক,
আনন্দের ফল্গুধারা,
হৃদয়ে যা মৃত হ'য়ে ছিল,
আর যন্ত্রের প্রতি আমাদের অগাধ ভালোবাসা,
তার সাথে সমুদ্রের সীমাহীন নীল
গ্রীষ্মমণ্ডলের বাতাস যেথায় মুখে এসে লাগে।

এখন গভীর রাত।
যন্ত্রটি তালে তালে
গায় গান,
বিশ্বাস ছড়ায় তার উষ্ণ নিঃশ্বাসে।

যদি জানতে জীবনকে কতো ভালোবাসি!
আর কি দারুণ ঘৃণা করি
অলীকের
মোহ···
ধ্রুবস্থির আমি, অবশ্যম্ভাবী ভোরের মতোই,
টুকরো করবো তুষার পর্বত মাথার আঘাতে।
তখন দিগ্‌বলয়ে
সূর্য রক্তবর্ণ
হ্যাঁ, আমাদেরি
উজ্জ্বল
সূর্য
উঠবে ঝলমলিয়ে।

ছোট্ট প্রজাপতির মতো
আমার পাখ্‌না দুটো
পুড়ে যদি যায় তবে যাক্‌,
অভিশাপ দেবো না আমি
কাঁদবো না শোকে,

কেননা নিশ্চিত জানি
মরবই আমি।

কিন্তু এ মৃত্যু,
যখন পৃথিবী
ঝেড়ে ফেলছে
তার বিষাক্ত
পরগাছা,
যখন পুনর্জীবিত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ,
এ মৃত্যু সঙ্গীত তখন,
সত্যই গান।

স্মৃতি

একজন সাথী ছিল আমার
চমৎকার সাথী
কিন্তু...বড়ো খ্যানখেনে ছিল তার কাশি।
বয়লারে আগুন জ্বালিয়ে রাখা ছিল তার কাজ ;
ঝুড়ি ঝুড়ি কয়লা দিত ঢেলে
আর পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই
রাতভোর বারোঘণ্টা লাগাতার।

মনে পড়ে তার চোখ দুটি।
পিপাসার্ত তার দুটি চোখ
কিভাবে করতো পান
আমাদের খাঁচায়
হঠাৎ কখনো এসে পড়া
প্রতিটি সূর্যালোকরেখা।

আঙ্গিনায় যখন জাগতো
পাতার মর্মর,
আকাশের নীলে
উড়ে যেত বলাকার সারি,
কি তাড়াতাড়ি জন্ম নিত
বসন্তের জন্য অসহ পিপাসা
অনুভব করতাম আমি
কি আবেদন,
কি ব্যথা, কি দুঃসহ ব্যথা
তার চোখের তারায়!
ছোট্ট, একটি ভিক্ষা তার চোখে
বসন্তের জন্য,
একটি বসন্ত আরো।

বসন্ত এলো
উপ্‌চে-পড়া রূপ নিয়ে,
সাথে নিয়ে সূর্য,
স্নিগ্ধ হাওয়া
আর গোলাপ।
নির্মল আকাশ
মেতে উঠলো
দূর থেকে ভেসে আসা
ফুলের সৌরভে।
এখানে তবু অন্ধকার
তেমনি রইলো চেপে
জগদ্দল পাথরের মতো।

হঠাৎ
গোলমাল দেখা দিল কারখানা-জীবনে।
ইঞ্জিনের চলার ছন্দে পড়লো যতি,
ঘড়ঘড় করলো খানিকটা
তারপর একেবারে থেমে গেল।
জানিনা কেন—
হয়তো
আমার সাথীটি মারা গিয়েছিল বলে।
হয়তো ঠিক তা নয়।
অথবা হয়তো
ক্ষুধার্ত বয়লার করেছিল আশা
তার অগ্নিময় জঠরে ঢালবে
কয়লার ঝুড়ি কোনো পরিচিত হাত।
হয়তো তাই, কিন্তু জানা নেই ঠিক।
তবু যেন মনে হলো

অস্ফুট কাতর স্বরে
বয়লারটা জানতে চাইছে ঃ
"কোথায় গেল সে ছেলেটি ?"

সে—সেই ছেলেটি—মারা গেছে।
আর এখন
বাইরে বসন্ত,
দূরে
আকাশের নীলে বলাকার সারি
কিন্তু সে আর দেখবে না কিছুই।

বেশ ছিল আমার সাথীটি,
চমৎকার সাথী!...
কিন্তু বড়ো খ্যানখেনে ছিল তার কাশি।
বয়লারে আগুন জ্বালিয়ে রাখা ছিল তার কাজ;
ঝুড়ি ঝুড়ি কয়লা দিত ঢেলে
পুড়ে গেলে ফেলে আসত ছাই
রাতভোর বারোঘন্টা লাগাতার।

বসন্ত

বসন্ত আমার, হে আমার শুভ্র বসন্ত,
এখনো অনাস্বাদিত, আগমনী উৎসব নেই,
দেখেছি তোমাকে শুধু ভোরের স্বপনে
শিরীষ গাছের শীষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে,
কিন্তু তুমি থামোনি এখানে।

বসন্ত আমার, হে আমার শুভ্র বসন্ত,
তুমি আসবে জানি বর্ষা আর তুফানের সাথে,
ভয়ঙ্কর ঝড়ে, আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে,
ফিরিয়ে দেবে তুমি আমাদের হৃত আশা যতো
রক্তক্ষরা ক্ষতস্থানগুলি যাবে মুছে ধুয়ে।

পাখীরা গমের ক্ষেতে মাতে প্রাণোচ্ছ্বাসে ;
খুশীতে ছড়াবে ডানা বিশাল আকাশে…
পরিশ্রমে মানুষ খুঁজে পাবে আনন্দধারা,
সহোদরের মতো সবাইকে ভালোবাসবে তারা।

বসন্ত আমার, হে আমার শুভ্র বসন্ত…
দেখতে পাই যেন তোমার প্রথম যাত্রা,
ছুঁইয়ে জীয়ন-কাঠি নিষ্প্রাণ চৌরাস্তার মোড়ে,
দেখতে চাই শুধু তোমার রক্তিম অরুণ
তারপর মৃত্যু হোক ব্যারিকেডে।

জঙ্গলের মাথায়
পিরিণের চূড়ায়
দুরন্ত হাওয়ার দাপাদাপি,
রওয়ানা হলাম
আমরা সাতজন
লড়াইতে ;
পিছনে আমাদের
অনেক দূরে পড়ে রইলো
পিরিন
আর তার তারাভরা রাত।

হিংস্র জানোয়ারের সাথে
ঝোপেঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে
পেরোলাম পথ।
ঘাসে ঘাসে যেন দেখতে পেলাম
আমাদের পিতাদের
ধুয়ে যাওয়া
রক্তের দাগ।
ঝরা পাতার স্তূপ
ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল
কোথায় রয়েছে শুয়ে চিরনিদ্রায়
আমাদের মা'রা।
আর মরচে-ধরা মাটিতে
চিহ্ন পেলাম
যেথায় নিয়েছে আশ্রয় ধরণীর বুকে
আমাদের প্রেয়সীরা।

সাতজন গিয়েছিলাম
লড়াইতে,
শুধু তিনজন
এলাম ফিরে।

মানব বন্দনা

তুমুল তর্ক

এক মহিলার সাথে,

বিষয় ঃ

"নূতন যুগের মানুষ"

মহিলাটি রগচটা, বুঝতেই পারছেন—

রেগে উঠে মাটিতে পা ঠোকেন.

এমন কি কেঁদেও ফেলেন।

প্রতিবাদের ঘোলাজলের তোড়ে

আমি দিশাহারা,

আর তার সাথে বিরামহীন

কথার শিলাবৃষ্টি।

—একটু শুনুন—বলি আমি—শুনুন,

একবার…

কিন্তু তিনি আমায় থামিয়ে দিলেন রেগে ঃ

—থামুন তো দয়া করে!

মানুষকে ঘৃণা করি আমি!

আপনার সমর্থনের যোগ্য নয় সে।

খবরে পড়েছি, একজন

দা' দিয়ে কেটেছিল,

কুপিয়ে মেরেছিল তার নিজের ভাইকে।

তারপর

হাত মুখ ধুয়ে

গির্জায় গিয়েছিল চ'লে

আর…মন তার নাকি ভারমুক্ত হ'লো।—

দারুণ অস্বস্তিতে ভারী হ'লো আমার মন।

আমি আবার

খুঁড়িয়ে চলি

পুঁথিপড়া বিদ্যায়

তাই বললাম ধীরে ধীরে
শান্ত স্বরে
সহজ ভাষাতে ঃ
আসুন এই ঘটনাটার কথা ধরা যাক।

মোগিলা গ্রামে ঘটেছিল এটি ।
বাপ লুকিয়ে রেখেছিল
টাকা।
ছেলে খোঁজ পেয়ে
নিল ছিনিয়ে
তারপর গুম-খুন করলো বাপকে ।
কিন্তু মাস না পেরোতেই, হয়তো-বা
সপ্তাহের মধ্যেই
ধরা পড়লো সে, তারপর···বিচার ।
আদালতে কেউ তো আর
পিঠ-চাপড়ে আদর করে না,
হ'লো তার ফাঁসির হুকুম ।
নিয়ে গেল আসামীকে
চোখে তার বিদ্বেষের ছায়া,
গলায় চাকতি ঝুলিয়ে পুরে দিল জেলে।
কিন্তু জেলখানায় সাচ্চা লোকের সংস্পর্শে এসে
পরিণত হ'লো সে
একজন মানুষে ।
জানিনা কোন
সোনার কাঠির স্পর্শে
রূপান্তরিত হ'লো তার
সবকিছু,
যেন একটা গানের সুরে সুরে
দিনের মতো স্পষ্ট হ'লো

নিজের ভাগ্যলিপি।
তারপর বললো নিজের মনেই ;
"কি ভুল না করেছি,
আর এখন তোমার জন্যে
ফাঁসিকাঠ।
ক্ষুধার তাড়নায়
বেসামাল হ'য়ে
ভুলের পঙ্কিল আবর্তে যাচ্ছ ডুবে।
তারপর অপেক্ষা করো জানোয়ারের মতো
কষাইখানায়,
যেদিকে তাকাও, চোখের সামনে শানায়—
ছুরি।
বাজে,
বড়োই বাজে,
দুনিয়ার বিধিব্যবস্থা!
কিন্তু হ'তে পারত, অন্য রকম কিছু..."
তখন সে গেয়ে উঠল
নিজের গান,
গাইল সে ধীরে, চাপা স্বরে।
তার চোখের সামনে ভেসে উঠল
এক চমৎকার জীবন—
তারপর
ঘুমিয়ে পড়ল
হাসিমুখে...

বারান্দায়
ফিস্ ফিস্ কথার আওয়াজ
তারপর মুহূর্তেক সব চুপচাপ,
ধীরে ধীরে কবাট খুলল কেউ।

একদল লোক, পেছনে সেপাই।

তাদের মধ্যে কে
নীরস ভারী গলায়
বলল তাকে ;
"উঠে পড়ো হে।"
অন্যরা তাকিয়ে রইল
অর্থহীন চোখে
ধূসর, স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের দিকে।
বিছানায় যে শুয়ে ছিল
বুঝল সে
আয়ু তার হয়েছে নিঃশেষ,
এক লহমায়
লাফিয়ে দাঁড়ালো, কপালের ঘাম মুছে
বন্য মোষের মতো
তাকালো তাদের দিকে,
কিন্তু ধীরে ধীরে
মনে হ'লো তার—
ভয় অর্থহীন,
মৃত্যু সুনিশ্চিত,
তখন হৃদয়ে তার জাগল
এক উজ্জ্বল আলোর রেশ।
—এবারে যাওয়া যাক ?—বলল সে।
—বেশ।
চলল সে। পিছু পিছু তার
সান্ত্রীদের সার
কিন্তু প্রাণে তাদের লাগল যেন হিমের ছোঁয়া।
নিজ মনে বললে সেপাই ;

"যত তাড়াতাড়ি চুকে বুকে যায়…
ডুবেছো এবার ভাই সাত হাত জলের তলায়।"

অলিন্দে সবাই
চুপি চুপি কথা বলে।
আনাচে কানাচে অন্ধকারের আস্তানা।
উঠানে নেমে এলো তারা,
ওদিকে আকাশে
অন্ধকার ফিকে হ'য়ে আসে।

দু'চোখ ভ'রে সে উষাকে দেখলো,
যেখানে
আলোর ঝর্ণায় স্নান ক'রছিল শুকতারা,
আর ভাবলো
কি দুর্বহ,
নিষ্ঠুর,
অন্ধ
ভাগ্যলিপি তার !
"আমার দিন তো শেষ…
ফাঁসিতে ঝুলবো।
কিন্তু আমার সাথেই কি
সবকিছু হবে শেষ ?
আসবে গানের থেকেও মধুর
জীবন নবীন
সৌন্দর্যে হার মানবে ফাল্গুনের দিন…"
স্মরণে এলো সেই গান
আর কি যেন মনে প'ড়ে গেল তার।
বহ্নিশিখা জ্বলে উঠল চোখে।

এক অপূর্ব হাসির আভায়
উদ্ভাসিত হ'লো তার মুখ।
বুক ভ'রে শ্বাস নিয়ে গেয়ে উঠল গান।

কি মনে হচ্ছে, হয়তো বা
প্রচ্ছন্ন রয়েছে এতে
কোনো হিষ্টিরিয়া রোগীর কাহিনী?
ভাবতে পারেন! যা মন চায় তাই,
কিন্তু আপনি
ভুল করছেন আজ।—
লোকটা ধীর শান্ত স্বরে,
শব্দের পর শব্দ
স্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে গানটি গাইল।
তারা ওকে দেখল
হতবুদ্ধি হ'য়ে
চোখে তাদের আতঙ্কের ছাপ।
গোটা কয়েদখানাটাই যেন
কেঁপে উঠল ভয়ে,
আর অন্ধকার পালিয়ে গেল ছুটে।
স্মিতহাস আকাশের তারারা সে গান শুনে
চেঁচিয়ে বলল তাকে ঃ
"সাবাস মানুষ!"
এরপর সব জলের মতো সোজা, দড়িটা
নিপুণভাবে
মাথা গলিয়ে গলায়, তারপর
মৃত্যু।
কিন্তু সেখানে, সেই বিকৃত
নীল ঠোঁটের কোণে
গানটা লেগে রইলো তবু।

এবার শেষদৃশ্যের অবতারণা।
কি মনে হচ্ছে আপনার ?—
বেচারী মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন,
তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন ঃ
"ভয়ঙ্কর! কি সাংঘাতিক! এমন ভাবে বলছেন
যেন
সেখানে হাজির ছিলেন নিজে!"...
ভয়ঙ্করের কি আছে এতে ?
লোকটা একটা গান গেয়েছিল।
কি অপূর্ব, তাই না ?

বিদায়
(স্ত্রীকে)

কখনো আসবো আমি তোমার স্বপনে
অপ্রত্যাশিত প্রবাসী অতিথির মতো।
রেখো না আমাকে তুমি পথে অপেক্ষারত—
আগল দিও না দরজায়,

নিঃশব্দে ঢুকবো আমি, ক্ষণেক বিশ্রাম নেবো,
দৃষ্টিতে আঁধার সরিয়ে দেখবো তোমাকে,
দু চোখ ভ'রে দেখা হয়ে গেলে
একটু চুম্বন রেখে যাবো আমি চলে।

যাবার আগে

নির্মম নিষ্ঠুর এ সংগ্রাম,
এ সংগ্রাম, বলে সবে, মহারণ।
আমি প'ড়ে গেলে অন্য কেউ নেবে সেই স্থান···এই মাত্র,
এখানে অর্থহীন কোনো ব্যক্তিগত নাম।

একঝাঁক বুলেট, তারপর কীটের খাবার
অত্যন্ত সহজ সরল এই পরিণাম।
হে দেশবাসী, তোমাদের ভালোবাসি, তাই
ঝড়ের সাথে আমি আসবো আবার।

বেলা ২টা—২৩. ৭. ১৯৪২
মৃত্যুর দু'ঘণ্টা পূর্বে লিখিত।

ইভান পেইচেভ ॥ ১৯১৮— ॥

দেয়াল

জেলখানার মৃত্যুগুহায়
মার্চ করে চলে
লোহার নাল-লাগানো ভারী বুট ঃ
লেফ্‌ট্‌-রাইট, লেফ্‌ট্‌-রাইট, লেফ্‌ট্‌…
খাকী কোট,
ইস্পাতের বন্দুক,
ঠাণ্ডা দেয়াল।
লেফ্‌ট্‌—রাইট, লেফ্‌ট্‌-রাইট, লেফ্‌ট…
মনে পড়ে কি নিজের বাড়ী—
তার দেয়ালের গায়ে অন্ধকার ফোকর।
সেখানে, দেয়ালের পাশে
ভোরের আলো ফুটত নীড়ে নীড়ে পাখীর কূজনে
কতো বড়ো হয়েছো দেখবার আশে—
চুপি চুপি দাঁড়াতে তুমি আঙ্গুলে ভর ক'রে।
এখানেও দাঁড়াবে তুমি
অন্য এক দেয়ালের গায়ে,
গুমোট-ভরা এ কালো দেয়ালে
বন্দুকে মাপা হবে তোমার উচ্চতা,
নক্ষত্র ছাড়িয়ে।
এ দেয়ালের পিছে
গাছগুলি রসে ভরপুর,
ডানাতে আলোর চমক উঁচুতে আকাশে,

পাইনের সারি
বন্দুদের মতো
তীক্ষ্ণাগ্র সবুজ তীরে
ফুঁড়েছে আকাশ।
বাতাস পালের বুকে কাঁপে থরো থরো
মিশে যায় সাগরের সুনীল গর্জনে—
এ দেয়ালের পিছে।
এ দেয়ালের পিছে
নিস্তব্ধ আঁধার চুরি ক'রে নিয়ে যায়
ভেজা ভেজা ঘাসের মর্মর,
ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে,
রুটি নিয়ে কেউ আছে অপেক্ষায়।
রাত্রি হাঁপায়।
বিশাল আকাশ দোলে।
কোমল অধর
কর্কশ সুদীর্ঘ চুম্বনে।
গমের ক্ষেত উত্তাল গানে,
অশ্বক্ষুরের প্রতিধ্বনি প্রান্তরে প্রান্তরে
আঁধার ঘেরা ছায়ায় লুকিয়ে থাকা হরিণ
ডেকে ওঠে ভয়ে...
ফায়ার!—

বয়সের ভারে ন্যুব্জদেহ মা গো, তুমি কাঁদো!
তুমি দূরের প্রেয়সী, কাঁদো!
তুমি, সাথী আমার, নিজের যন্ত্রের কাছে আছো,
তুমি, যে পাথর ভাঙ্গছো,
তুমি, যে অন্ধকার খনির অভ্যন্তরে কয়লা কাটছো,
তুমি, যে নৌকার হাল ধরে আছো,
হাওয়ার ঝাপটায় রুক্ষ যার মুখ,
খবরদার, এক ফোঁটা চোখের জল যেন না পড়ে।

ছিন্ন শিরামুখে
ঢেলে দেবো দেহের উষ্ণতা
শীতল মাটিতে।
সইতে না পেরে মানুষের ভার
এ দেয়াল ভেঙ্গে পড়বে।
সিমেন্ট আর পাথরে লেগে থাকা
রক্তের দাগ
পরিণত হবে আশাতে আর পতাকায়।
১৯৪৩

ভয়

অনেক সূর্যের আলোয় জ্বালা করে চোখ,
জ্বালা করে অনেক দৃষ্টিতে, তামাকের ধেঁায়ায়, সুরায়,
হাওয়ার ঝাপটে, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে,
জ্বালা করে দেখে ইষ্টিশন, সময় তালিকা, রেল লাইন
নিরন্তর ছুটছে যে দিগন্তের দিকে
সাথে নিয়ে ইঞ্জিন, তার আর সিগন্যাল।
কালো ধেঁায়া, হেডলাইট, ছাড়িয়ে গ্রাম শহর,
অথচ পৌঁছে দেয় না আমাদের কোনোখানে।
আমাকে তাড়া ক'রে ফেরে বোবা প্রতিচ্ছবি
আর চিন্তার অনাস্বাদিত বেদনা,
বন্দরের আটচালা খোপে বিষাদের হাসি,
কাচ আর কুলুপের ফাঁকে দেখা দৃশ্য।
বেদনা আমার শান্ত প্রান্তরের জন্য, দ্বিখণ্ডিত ক'রেছে যাকে
রেললাইনের নির্বোধ গতির আবেগ—
বেদনা আমার সবকিছুর জন্য, নিকটে বা দূরে।
স্বপ্নেও দেখতে চাই না ঠোঁট,
হারিয়ে ফেলেছে যে হাসির সুষমা,
শক্তিহীন ফ্যাকাসে হাত
ঝুলে-পড়া একরাশ বিবর্ণ চিঠির ওপর ;
অথবা ধ্বসে-পড়া বাড়ী, কাদাময় পথ,
অপ্রয়োজনীয় জিনিষে ভরা তোরঙ্গ,
দোকান-হাটের পথে বর্ষা—
খুলে ধরে যে তার ধূসর শূন্য থলি।
চাইনা, কখনো চাইনা আমি
থাকতে একা, সাথে নিয়ে শুধু একরাশ কথা,
ভালোবাসা, ঘৃণা অথবা সত্য,

আর যদি প্রয়োজন হয়—নিরবে হারিয়ে যাবো,
ভালোবাসা আর মানুষের আশায় তবু
কমনীয়তা-ভরা ঘরের কোণে,
চোখ বুজবো চিরতরে
সত্যি, অনেক, অনেক সূর্যের আলোয়।

ছায়া

তোমাকে কি হারাবো আমি, বলো,
নিষ্ঠুর হবে কি কথাগুলি
যা দিয়ে আমাকে ব্যথা দেবে তুমি
অথবা নিঃশব্দ পদক্ষেপের ওপর,
আমাদের ছায়াকে ঘিরে এই দিনে
কলতানে মেতে উঠবে বৃষ্টির ফোঁটা,
শান্ত, নিঝোরে ঝরে-পড়া ঝলমলে বৃষ্টি ?
পারবো কি তখন
নিঃস্ব হবার ক্ষোভ জয় ক'রে,
বৃষ্টি-ভেজা চোখের পাতা নিয়ে
ফুল আর পাখীর সাথী হ'তে ?
নির্ঝরিণী বুকে ক'রে ছায়া
ছুটে চলে নিরন্তর, তুমিও কি
ছেড়ে চলে যাবে তেমনি ত্বরাতে
ছায়াদের মতো, একা,
যাবে না কি রেখে বিন্দুমাত্র অনুরাগ ?
হায়, কি নিদারুণ এ মুহূর্তে,
অবশ্যম্ভাবী ব'লে ভয়ঙ্কর আরো।

এ মুহূর্ত ক'রে দিতে পারে পাথর তোমাকে,
পরিণত হবে তুমি প্রস্তরিত কমনীয়তায়,
মানুষের ছায়ায়,
প্রতিফলিত পরমাণু লাভাতে,
উৎসর্গিত সংখ্যাহীন শতাব্দীর
লোপবুদ্ধি অনাদি অনন্তে।

ভেসেলিন হানচেভ ।। ১৯১৯-১৯৬৬ ।।

না, ঘুমাতে পারি না আমি

না, ঘুমাতে পারি না আমি, যেতে চাই আকাশের
চাঁদোয়ার নীচে
যেথায় জ্বলছে তারা আর মাতাল হাওয়ার পাগলামী।
থাকবে সেথায় তুমি আমার সঙ্গিনী, তোমাকে বলতে চাই নিজে
অব্যক্ত কথাগুলি, বলতে যা এতোদিন হয়তো সাহস হয়নি···

অনেক ভালোবাসিনি তোমায়, করিনি অনেক আদর।
হে প্রিয়তমা,
কর্তব্য ঠেলেছে দূরে, কেঁদো না তা'বলে, কোরো না অভিমান?
ভালোবাসা মৃত্যুঞ্জয়ী হবে, স্বপ্নেরা অমর হবে পার হয়ে রাত্রির সীমা
ভোর হ'লে আমি তাই যাবো লড়াইয়ের ময়দান।

স্তেপের ভূমিতে যদি মৃত্যু হয় মোর, হিমচোখ নক্ষত্রের দেশে,
অশ্রুপাত নয় সমাধিতে, শুধু ভালোটুকু মোর মনে রেখো
অভ্যর্থনা কোরো আনন্দকে, এনেছি যা জিতে অনেক ব্যথার বলির শেষে,
মিশিয়ে আমারটুকু অনেক ভালোবেসো, দ্বিগুণ স্বপ্ন দেখো।

ঈর্ষায় জ্বলবো না আমি, খুশী হবো নিশ্চিন্ত আনন্দে।
বেদনার তরে সংগ্রাম করিনি আমি, আমার এ যুদ্ধ নয়
অশ্রুধারা তরে।
ভোর হয়ে এলো, অন্যেরা সামিল সবে লড়াইয়ে সানন্দে।
শুভরাত্রি জানাই এবার, প্রেয়সী তোমারে।

বেঁচে আছি

আমার ভিতরে সবকিছু
প্রচণ্ড উত্তাপে শ্বেতপ্রভ।
বেঁচে আছি।
পড়ে গিয়ে ব্যথায় চিৎকার করি।
বেঁচে আছি।
রোগের বেদনা এ নয়।
ব্যথা লাগে পড়ে গেছি ব'লে।
বেঁচে আছি।

ধনুর্গুণের মতো কাঁপছে সর্বাঙ্গ
বেঁচে আছি।
দেহে প্রচণ্ড উত্তাপ, প্রলাপে চিৎকার করি।
বেঁচে আছি।
জ্বরের ঘোরে কাঁপছে না দেহ,
কাঁপছে ক্রোধে,
থেমে গেছি বলে।

বেঁচে আছি।

মানুষেরা শোনো, বেদনা আমার নিশ্চল মুহূর্তে।
বেঁচে আছি।
হারিয়ে-যাওয়া পথে পথে আর্তনাদ করি।
বেঁচে আছি।
মানুষেরা শোনো।
অগুন্তি প্রাণের জন্য আমার প্রার্থনা,
মৃত্যুকে চাই না আমি।

বেঁচে আছি।

অপ্রসৃত পৃথিবীর আকৃতি আমার অন্তরে।
বেঁচে আছি।
ব্যথায় আর্তনাদ না যদি করি,
নিষ্প্রাণ দেহ হবো আমি।
বেঁচে আছি।
মানুষেরা,
এ রোগের নিদান শোনো ঃ

বেঁচে আছি।

সেরা ছেলে

বড়ো ভালো ছাত্র ছিল সে,
ক্লাসের মধ্যে সবার থেকে সেরা
প্রথম বেঞ্চে জায়গা ছিল তার,
বাঁ-দিক ঘেঁষে, পাশে জানালা,
ছোটোখাটো ছিল শরীরখানা,
চুল তো নয় যেন অগ্নিশিখা—
লোহিত বরণ ফণা,
আর পাঁচজন ছোটো ছেলের মতো
দু-গাল ভরা কালো দাগের ছোপ।

বড়ো ভালো ছাত্র ছিল সে।
সব পড়াই তৈরী থাকত তার,
সঠিক জবাব দিত পরিষ্কার,
থাকত না চুপ করে,
শিক্ষক যখন
টেবিলের পেছনে দাঁড়িয়ে সোজা
করতো জিজ্ঞাসা ঃ
—দ্বিতীয় বুলগার রাজত্বে রাজা ছিল কারা ?
—আজোর দ্বীপমালা কোথায় অবস্থিত ?
—কি পাওয়া যায়, মেলাই যদি
শোরার সাথে তিনটি অণু রূপো ?

বড়ো ভালো ছাত্র ছিল সে
ক্লাসের মধ্যে সবার থেকে সেরা।

হঠাৎ
একেবারেই অকস্মাৎ

ঢুকলো ক্লাসে পুলিশ অফিসার।
টেবিলের পেছনে দাঁড়ালো সে সোজা,
তর্জনীতে করলো নির্দেশ
বাঁদিকে ঘেঁষে জানালার পাশে প্রথম বেঞ্চিখানি,
বললো হেঁকে ঃ
—উঠে এসো বোর্ডের কাছে।
এসো।
বলো।
প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দাও
বিশদভাবে, পরিষ্কার।

যন্ত্রণার ক্লাস ছিল সেটা।

দেয়াল থেকে
জেলখানার ফোকর দিয়ে যেন
লেভস্কি আর বোতেভ দেখছিল চেয়ে।
শূন্য বেঞ্চির 'পরে
ভয় চেপে বসে
ফিসফিসিয়ে বলে ঃ
—কারা ছিল তারা,
যাদের সাথে গিয়েছিলে করতে চড়ুইভাতি ?
—ঠিকানা কি সেই বাড়িটার
সবাই যেথায় হয়েছিল জড়ো ?
—কি দিয়েছিল তোকে ?
—কাকে দিলি সেটা ?

নির্ভীকতার ক্লাস ছিল সেটা।

বড়ো ভালো ছাত্র ছিল সে
ক্লাসের মধ্যে সবার থেকে সেরা।
কিন্তু কিছুই বললো না সে।
জবাব দিল প্রত্যেক প্রশ্নের
নির্বাক উত্তরে।
নিরুত্তর।
যখন তাকে প্রশ্ন করলো ক্লাসে।
নিরুত্তর,
যখন তাকে বাইরে নিল টেনে।
নিরুত্তর,
যখন তাকে দাঁড় করালো সোজা
পিছনের আঙিনায় দেয়ালের সামনে।
নিরুত্তর,
যখন ছুটির ঘণ্টা বাজলো অবশেষে
বন্দুকের নলে।

বড়ো ভালো ছাত্র ছিল সে।
জবাব দেয়নি,
তাই পেল নম্বর সব থেকে বেশী
অমরত্বের ক্লাসে।

পারীর বৃষ্টি

(নগরকীর্তনের সুরে একটি গান)

পুরোনো, অনেক পুরোনো কাহিনী সে।
পুরোনো সে পারীরই মতো।
শিল্পী একজন ফুটপাথে বসে
একটি মেয়ের ছবি অঙ্কনে রত।

—যাই তবে—বললো সে বিদায়ের ক্ষণে।—
চলি আমি।
ভালোবাসা নেই, ফুরিয়েছে পট আর রুটি।
রংয়ের মধ্যে আছে বেঁচে
কেবল কালো রং।
পারী থেকে—এখানে শুধুই রাস্তা চলেছে সীনের দিকে।
—যেয়োনা, শিল্পী মিনতি জানালো।—
রংয়ের মধ্যে আছে তোমার মুখের তিনটি রং।
সোনালী, নীল, লাল।
এই পারীতে—আছে এক-আকাশ আলো
আর একটি ফুটপাথ,
যেথায় ঝরে পয়সা ছোটো বড়ো,
অঢেল পয়সা হবে জড়ো।

পুরোনো, অনেক পুরোনো কাহিনী সে,
পুরোনো সে পারীরই মতো ঃ
শিল্পী একজন ফুটপাথে বসে
একটি মেয়ের ছবি অঙ্কনে রত।

—ফুটপাথ মশাই—শিল্পী বলে কানে কানে
হাঁটু গেড়ে ব'সে—

তোমার চওড়া বুকের ওপর আঁকতে দেবে কি
একটি মেয়ের ছবি।
তাতে আমি রং লাগাবো নীল, সোনালী, লাল
আমার তিনটি রঙ্গীন চক দিয়ে।
ও যাতে কষ্ট না পায় শীতে
যতক্ষণ থাকবে তোমার বুকে,
এনো ডেকে পারীর সূর্য, দিতে আলো
সারা বেলা ধরে,
আসে যেন আমার চারিপাশে
অনেক জোড়া পা, হাত আর চোখ
ছুঁড়বে যারা পয়সা ছোটো বড়ো,
অঢেল পয়সা হবে জড়ো।

পুরোনো, অনেক পুরোনো কাহিনী সে,
পুরোনো সে পারীরই মতো:
শিল্পী এক ফুটপাথে বসে
একটি মেয়ের ছবি অঙ্কনে রত।

একপাশে রেখে নিজের টুপি
বললো তাকে:
"এবার ভিক্ষে করো!"
তারপর, অনেক যত্ন করে
পরিয়ে দিল সোনা চুলের রাশি
থোকা থোকা গোছে।
তারপর—নীল চোখের তারা,
পরে—"বিদায়" বলা ঠোঁট,
ছোট্ট দুটি হাতে
পীচের সৌরভে ভরা
ফুলের স্তবকখানা।

—যেওনা—বললো সে আদর করে প্রায়
সোনালী-চুল তার মেয়েটিকে—
বিছানা দেবো কিনে—অনেক অনেক ভালো,
কিনে দেবো ফুল—এক সাজি আলো
আর সন্ধ্যেবেলায়
কালো বজরার মাথায় চেপে
সূর্য যখন মিলিয়ে যাবে দূরে
সীন নদীর বুকে,
আমরা তখন ধনী
অনেক পয়সা হবে জমা,
অঢেল পয়সা ছোটো বড়ো
হবে জড়ো।

পুরোনো, অনেক পুরোনো কাহিনী সে,
পুরোনো সে পারীরই মতো ঃ
শিল্পী এক ফুটপাথে বসে
একটি মেয়ের ছবি অঙ্কনে রত।

ছায়া পড়লো পাখীর আর মেঘের,
ছায়া পড়লো মানুষের,
ছবির গায়ে কাটলো অাঁকিবুকি।
পড়লো ঝরা-পাতা আর অনেক কলার খোসা।

তারপর হঠাৎ, বৃষ্টি পড়লো ঝরে।
পারীর বৃষ্টি আহা।
দুষ্টু বড়ো জলের ফেঁাটাগুলি
খেলে চললো লুকোচুরি-খেলা।

সেই একা থামলো অবশেষে,
ছড়িয়ে দিলো মুদ্রা রাশি রাশি
অঢেল তার পয়সা রূপোর রং।
থামো—শিল্পী বললো ধীরে,—ও যে যাবে চলে।
"ও যে যাবে চলে"—হৃদয়ে তার দারুণ ব্যথাভার।
মেয়েটি তখন কেঁদে কেঁদে সারা।
সোনালী, লাল, নীল চোখের জলে ভেসে
চললো সে সীনে হ'তে হারা।

পুরনো, অনেক পুরনো কাহিনী সে,
পুরনো সে পারীরই মতো :
শিল্পী এক ফুটপাথে বসে
একটি মেয়ের ছবি অঙ্কনে রত।

আলেকজান্দার গেরোভ ॥ ১৯১৯— ॥

বসন্ত রাত

কে আমার শার্শিতে হানে অস্থির আঘাত ?
বাইরে ভেজা অন্ধকার ধোঁয়ার নিঃশ্বাস ছাড়ে ;
টুকরো টুকরো মেঘের যাতায়াত
আকাশের কালো সামিয়ানা জুড়ে ;

কানে আসে, আদুর পাহাড় বুকে
নির্ঝরিণীর মৃদু কলতান।
অনেক আশার ফাল্গুন বুঝি এলো।
হৃদয়ে বুঝি তাই অশান্ত আহ্বান।

লাফিয়ে উঠে, শার্শি ভেঙ্গে চূর্ণ করে ফেলি।
বিজলী হানে তীক্ষ্ণ ছুরির ঘাত,
ঘরের মধ্যে তেজী হাওয়ার তালি
বাজায় যেন প্রাণমাতানো রাত।

দম আটকে আসে তার কালো চুলের রাশে,
অন্ধকারের উষ্ণ দেহ জড়াই আলিঙ্গনে,
আসে যখন কালবোশেখী মেঘের ভেলায় ভেসে
আমি যেন বিভোর তখন তরুণ সুরা পানে।

ধরার বুকের মাঝে সুপ্ত প্রাণের লাভা
প্রচণ্ড এক অনুভূতি জাগায় সারা মনে।
সব কিছুই রাঙ্গিয়ে দিল প্রেমের গোলাপ আভা
হারিয়ে গেছে কূল, সীমানা জানিনা কোন খানে।

এই রাত। এমন আবেগ পাগল-করা,
প্রকৃতিরই কাছে পাওয়া এযে আমার ঋণ।
জানি আমি, কাল সকালে সূর্যালোকে ভরা
ঝলমলিয়ে উঠবে হেসে সবুজ একটি দিন।

কণ্ঠস্বর

তারার ঝালর দেওয়া আকাশ,
তার অসীম শূন্যতা নিয়ে
মাথার উপরে ঝুলে আছে যেন
তীক্ষ্ণ দাঁত বিরাট মুখব্যাদানে।

ক্রোধান্বিত ক্ষুধার্ত সাগর
দাপাদাপি করে দুরন্ত শিশুর মতো।
রুক্ষ পাথরের বুকে অবিরাম
আছড়ায় মৃত-জাত ঢেউ।

বালুকাবেলার বাগান থেকে
হিমেল বাতাস ছুটে আসে।
সমগ্র পৃথিবী যেন বিশাল মরুভূমি
আর জীবনটা পুরোপুরি অর্থহীন।

এমন অসহ মুহূর্তে আখরোট গাছের ছায়ে
দেখলাম প্রেমিক যুগল।
শুনলাম তাদের কণ্ঠস্বর, প্রাণখোলা হাসিতে তাদের
চারিদিক মুখরিত হ'লো।

দু'হাতে বুক চেপে ধরে
দ্রুতপায়ে চললাম অন্ধকার রাতে
আপন গৃহের পানে, আপন জনের কাছে।
ডুবে যেতে প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি কাজে।

বুকের পাষাণভার দূর হলো যেন—
ভয় কোথায় ছুটে পালালো দূরে।
শুনেছিলাম শুধু মানুষের কণ্ঠস্বর
আর তরুণীর নির্মল হাসি।

অনুভূতি

অনুভূতি আমাদের ডানা ভর করে' দিগন্তে মিলালো…
এই সেইদিন হাত-নেড়ে বিদায় দিলাম।
চলে যেতে যেতে বলেছিলে তুমি ঃ
"আমাকে রাখবে তো মনে!"

"মনে রেখো।" আমি তো রাখিনি মনে।
ছায়াছবির মতো দেখেছি তোমাকে।
তারপর ভুলে গেছি। ভারশূন্য মনে
অনেক অনেক পথের পথিক হয়েছি।

এখন অপ্রয়োজনীয়, সঙ্গীহীন
বার্ধক্যের জড়তার মাঝে।
ঘন ঘন আর বাজে না টেলিফোন,
যদিও বা বাজে, খোঁজে কেউ ভুল নম্বর।

এলোকেশী সেই তরুণী সুন্দরী
চকচকে-বোতাম-আঁটা উর্দি পরে
"চিঠি" বলে হাঁকে নাকো আর
আমার ঘরের দরজায়।

অশান্ত ইচ্ছারা সব ভিড় করে আসে,
মনে হয়, যাকেই দেখি-না কেন পথে
বলি তাকে ডেকে
"একটুকু মনে রেখো মোরে"।

আশা করি তোমার অবস্থা ভিন্ন।
হয়তো তোমাকে কেউ আজো
চেয়ে দেখে ভালোবাসা-চোখে
যেমন দেখতো আমায় বহুদিন আগে।

কবুতর

সব থেকে সুন্দর কবুতরীটি
অকস্মাৎ আজ মারা গেল।
তার ছোট্ট একমুঠো দেহটিকে
শীতল মাটির পরে শুইয়ে দিলাম।

কবুতর তার ছানাগুলি নিয়ে
উড়ে চলে গেল মেঘ পার হয়ে,
ভোরের শিশির-স্নাত পাখা তার
হাওয়া কেটে শন্ শন্ চলে।

তারপর, চোখের আড়ালে কোন গৃহকোণে
অসীম বিষাদের ভার বুকে নিয়ে
শুরু হলো তার বিলাপ, একটানা
ডেকে চললো সাতদিন ধরে।

আমি বুঝি ওকে। এই সেই
জীবনের আকুল আকুতি।
সুখ, শান্তি আর সৃষ্টির তরে
জীবনের সহজাত ব্যাকুল প্রকাশ।

আমাদেরও এমনিই হয়—আমরাও
হয়ে পড়ি সঙ্গীহীন,
আমাদের হায়, ওড়বার পাখা নেই
বহুদিন ধরে' তাই ব্যথার যন্ত্রণা...

বোগোমিল রাইনোভ ॥ ১৯১৯— ॥

আট বছর বয়সে

পোড় খেয়ে যাতে বড়ো হতে পারি
আমার জীবন শুরু তাই ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে।
প্রথমটা—সব থেকে নিদারুণ
হারালাম মা'কে
আট বছর বয়সে।

আট বছর বয়সের কথা
খুব মনে থাকে।
যবে থেকে হারালাম তাকে
হয়নি সে মোর কাছছাড়া।
জানিনা তাদের কথা
মা যাদের আছেন জীবিত।
তারাও কি মা'র সঙ্গ পায়
এমনি সর্বদা
যেমনটি আমি।

আর আমি
এখনও পায়ে পায়ে হাঁটি
ঘনঘোর অন্ধকার পথে।
আর নিদ্রাহীন রাতে
তাঁর দৃষ্টির কিরণসম্পাতে
নিঃসঙ্গ অভিনেতার মতো
চলি ফিরি অন্ধকার স্টেজে
বন্দী ছোট আলোক বৃত্তের মাঝে।

আর আমি, পায়ে পায়ে হাঁটি
চারিদিকে অন্তহীন অন্ধকার,
নিঃসঙ্গতা, বৈরিতা,
পরিত্যক্ত জঞ্জালের মিলিত আঁধার।
অন্তহীন অন্ধকার।
মা আমাকে আলো দেন তবু—
যতটুকু প্রয়োজন দেখতে নিজেকে,
যতটুকু প্রয়োজন হারিয়ে না যেতে
অন্ধকারে।
যতটুকু আলো দিতে পারে
একজোড়া নীল চোখের স্নেহ।

আট বছর বয়সে হারিয়েছি তাঁকে,
আট বছর। কি কপাল!
আট বছর বয়সের কথা
খুব থাকে মনে।

ভালেরি পেত্রোভ ॥ ১৯২০— ॥

তারার নীচে গরুর গাড়ী

বলকানের কোলে, হেই সেথায়, দুটো কাঠ-চেরাই কল থেকে
গাঁয়ের দিকে নেমে এসেছে সোজা খাড়াই পুরোনো পথ,
সেই পথে অন্ধকারে বোঝাই ক'রে তক্তা থাকে থাকে
ক্যাঁচোর-কোঁচোর শব্দ ক'রে সার বেঁধে আসছে গাড়ী সাত।

সবার শেষের গাড়ী চড়ে আসছে গাড়োয়ান,
ভিন্ গাঁয়ের মাষ্টার সাথে, পথে আসতে রাত হয়েছে তার,
দুজনেই ধরায় বিড়ি, দীর্ঘ পথ চলে আলোচনা
তারার কথা, দুনিয়ার হালচাল ইত্যাদির বিচার।

"বলছো বটে, কিন্তু কথার মতো কথা হলো কি এটা
তুমি বলো ছায়াপথ পুরোটাই তারা দিয়ে গড়া।
আমরা জানি ঃ ভগবান একরাতে মাখছিলেন আটা,
হঠাৎ হাওয়ায় ছড়িয়ে গিয়ে হ'লো আকাশ-জোড়া।"

মাষ্টার নিশ্চুপ, মুখে তার জোগায় না কথা
মন দিয়ে শোনে শুধু বৃদ্ধের গলার গম্ভীরা
তক্তার উপর শুয়ে দৃষ্টি তার ধায় উর্ধ্বপানে
পুঞ্জে পুঞ্জে রয়েছে যেখানে লক্ষ-কোটি তারা...

একটানা ঐকতান বাজে গাড়ীর চাকায়,
বিশাল বনকান থেকে ভেসে আসে বাতাস নির্বাক,
বাতাস তবুও ভারি বনের রজনে, মেশে তায়
গন্ধ-নানা, ঘাম, কাঁচা কাঠ, আলকাতরা তামাক।

চারিদিক অন্ধকার, আঁধারের রূপ, অপরূপ অতি ঃ
পাহাড়, গাড়ী, তক্তা, পথ আর লোক।
নিকষ কালো জানোয়ার পথ চলে মন্থরগতি।
অন্ধকারে শুধু জ্বলে তাদের বড়ো বড়ো চোখ।

পাহাড়ের চূড়ায় একটি সমাধি

নক্ষত্রটি তার অতি সাধারণ, কিন্তু তাকে
শ্রদ্ধা করে সবাই, আসে যারা এ জায়গায়—
তার নীচে শুয়ে আছে ছোট্ট ছেলেটি
দ্বিতীয় শ্রেণীর পরেই যার স্থান মাটির তলায়।

ধরা পড়ে গেল, তাদের প্রশ্নের জবাবে
রইল নিরুত্তর—কখনো যা করেনি সে ক্লাসে কোনোদিনও,
গুলি চালালো তারা, লুটিয়ে পড়লো সে
মুখে শুধু একটি কথা নিয়ে "স্পাস দাদা বেঁচে থাকে যেন।"

এখন তার সমাধির আশেপাশে ভেড়া চরে
অনেক দূরের খামার থেকে আসা,
কিশোরেরা দল-বেঁধে এসে ফুলের স্তবক রাখে
দৃষ্টিতে তাদের, বিচ্ছুরিত ভালোবাসা।

মেঘের পাহাড় কালো হয়ে আসে সমাধি শিয়রে
রূপালী নদীর রেখা ঝিকিমিকি নীচে
এ দৃশ্যপটে যেন একগুচ্ছ কোঁকড়ানো চুল
ভেঙ্গে-পড়া মিনারের সারি এ গায়ের পিছে।

দূরের আঁধারঘেরা বনরাজি সাথে
আকাশ-মাটিতে মিশে হয় একাকার…
হয়তো বা এই সেই ছবি, দেশের মানুষ
যাকে মনে রাখে চিরদিন, দেয় অমরত্বের অধিকার।

দক্ষিণের বাতাস

আশ্চর্য ছিল সেই উষ্ণ বাতাস
পরশু এসেছিল বয়ে দক্ষিণ থেকে—
দ্বারে দ্বারে করাঘাত হেনেছে সে সারারাত ধরে,
নূতনের সাড়া যেন জেগেছে চারিদিকে।

পাতা ঠেলে ফোটে চেরীর মুকুল,
ত্বরায় উষ্ণ হলো তরুণ হৃদয়
আদর ক'রে ঝ'ড়ো হাওয়ার আঙুল
কিশোরী মাথার বেণী দুলিয়ে দেয়,

দুরন্ত সে খেলায় মেতে ওঠে
লুকোচুরি চলে পাহাড় কোলে
দখিন হাওয়া প্রাণের ছোঁয়া আনে,
আশ্চর্য সেই বাতাস ডানা মেলে···

আর আজ পড়ছি কাগজে সংবাদ,
ক্রোধে আর বেদনায় মুষ্টিবদ্ধ হাত—
ঐ দিনে, ঘড়িতে যখন একই ঘন্টা বাজে
নিকোস বেলোইয়ানিস পেয়েছিল মরণ-আঘাত।

অর্থাৎ, এ ছিল সেই বাতাস
আমাদের দেশে যা গিয়েছিল বয়ে,
মরণেও নিকোস তার বহ্নিশ্বাস
পাঠিয়েছে আমাদের তরে।

নিকোলাই জিদোরোভ ॥ ১৯২১— ॥

স্টেশন

বিশ্বের এক নামহীন স্টেশন
আমার ঘর…
কুলুপ নেই, দরজা নেই,—
প্ল্যাটফর্ম যেন বাইরের ফুটপাথ,
আর ট্রামের লাইন—
রেলগাড়ীর পথ।

অনেক দূর থেকে আসা দিনেরা এখানে
প্রায়ই বদলায়
তাদের সময় তালিকা ঃ
বিনা টিকিটে তারা
পার হয় পথ,
বেড়াতে যায় দিকে দিকে
নানা দেশে।
রাতের চাঁদ
আর দিনের সূর্য
যেন আমার ইস্টিশনের ঘড়ি।
আমার রেলগাড়ীকে থামাতে পারেনা
হিমেল কুয়াশার
প্রতিবন্ধক,
অথবা লাল সিগ্‌ন্যাল।

টিকিট-ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় কখনো
উচ্ছল আনন্দ,
কিংবা হয়তো হঠাৎ বেদনা,
আমি কিন্তু কুলুপ এঁটে রাখি
শত্রুর কাছে আমার হৃদয়
আর দিই খুলে
যখন দাঁড়ায় এসে বন্ধুরা প্রিয়।

হে আমার ঘর,
অজানা দিগন্তে যাবার
তৃষ্ণা যে জাগায়,
জন্ম দেয়
যে
স্বপ্ন
আর চিন্তা,
সমৃদ্ধ করে যে আমার পথকে…
প্রস্তাব এসেছিল
একটি অনেক শান্ত ঘরের,
উপরোধ করেছিল
কণ্ঠস্বর দূরের ঃ
ট্রামের আওয়াজে তুমি ঝালাপালা হবে,
ঘুমের ব্যাঘাত হবে রাতের বাতাসে,
বলেছিল তারা ঃ
আওয়াজকেই শেষে নিলে তুমি বেছে ?
আমার জবাব ঃ
আওয়াজ দীর্ঘজীবী হোক!

ট্রাম লাইনের ঝন্‌ঝনার মাঝে
দিবারাত্রি আমি হবো পথের পথিক।

শ্রান্তিকর সাক্ষাতের শেষে, যবে
পথের জন্য জাগবে আকুল আকাঙ্খা,
হৃদয় আমার
ভরপুর হবে না কি
ছুটে যেতে
ট্রামে চড়ে ঘরের উদ্দেশে ?...
নামহীন এক
বিশ্বের স্টেশন
আমার ঘর—
কুলুপ নেই, দরজা নেই,
প্ল্যাটফর্ম যেন বাইরের ফুটপাথ,
আর ট্রামের লাইন—রেলগাড়ীর পথ।

বসন্তের তুষার

শুভ্র তুষারপাত হলো সারারাত ধ'রে
ঢেকে দিল ঝোপঝাড়, পায়ে চলা পথ
আর খুশীর ভাবনায় দিল ভরে
হৃদয় আমার, আমার সঙ্গীত···
জানি, মার্চেই এ তুষার যাবে গলে,
কোলাহলে ভরে উঠবে বাগান, পাহাড়,
কিন্তু চেরী আর লেবু গাছের ডালে
থাকবে কি রং লেগে গানের আমার?
তবুও গানের ছত্র লিখে যাবো আমি।
যদিও বা হয় তারা ক্ষণস্থায়ী কলি।
তুষার-গলা জল থেকে টেনে নেয় জানি
প্রথম জীবন-রস শস্যের ডালি।

আসবে আমার পরে অন্য কোন কবি
ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হবে সূর্যালোকে
এই জেনে খুশী হবো, তার শ্যামলিমা
আকণ্ঠ করেছে পান আমার কণিকা থেকে।

ব্লাগা ডিমিত্রোভা ॥ ১৯২২— ॥

একাকিনী

আজো এই পুরুষ-প্রধান পৃথিবীতে
বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পথ চলা।
রাস্তার মোড়ে মোড়ে থাকে ওৎ-পেতে
অর্থহীন অপ্রিয় সাক্ষাতের জ্বালা।
পথও তোমাকে বিব্রত করে তোলে
কৌতূহলী দৃষ্টির পসরা মেলে।
পথে নারী একাকিনী।
অসহায় তুমি বড়ো, আর
তাই একমাত্র রক্ষাকবচ তোমার।

পরিণত করোনি তুমি কোনো পুরুষকে
নিষ্প্রাণ পাষাণে, যাতে তুমি
ভর দিতে পারো, অথবা হেলান দেবার মতো
দেয়ালে—আশ্রয়ের আচ্ছাদনে,
পুরুষের 'পরে কোরো না নির্ভর
যেমন দাঁড়াও তুমি সেতুর ওপর অথবা ট্রাম্পলিনে।
পথ চলো একাকিনী,
দেখা হোক তার সাথে একই কক্ষপথে
হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসো তাকে।

অথবা কলঙ্কিত হবে পথের ধূলায়
অথবা হারাবে দৃষ্টি অসীম ভূমায়
জানা নেই, তবু নিরন্তর প্রচেষ্টা তোমার।

নিশ্চিহ্ন যদি হয়ে যেতে হয় পথে
তবুও তোমার যাত্রা শুধু এইটুকু,
গন্তব্যে পৌঁছাবার নিশ্চিত নির্দেশ।
পথে নারী একাকিনী।
পৌঁছাতে পারবে কিনা কোনো দূরদেশে
সবকিছু তুচ্ছ করে পথ চলো তুমি,
তোমার যাত্রা তাই বাধাবন্ধহীন।
পুরুষ পারে না
নিঃসঙ্গিনী নারীর মতো
থাকতে একাকী।
অন্ধকার তোমার সম্মুখে
দরজায় কুলুপ লাগায়।
নিশিথে যাত্রা নাস্তি
পথে নারী একাকিনী।
চাবিওলার মতো সূর্য কেবল
ঊষায় উন্মুক্ত করে সুদূর দিগন্ত।
কিন্তু তবু সাহসে বুক বেঁধে
পথ চলো তুমি অন্ধকার রাতে।
প্রতিটি তোমার পদক্ষেপ
বিশ্বাসের এক একটি পরীক্ষা
সেই কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতি
যার তরে সয়েছো বহু ভীতিপ্রদর্শন।
বন্ধুর প্রস্তরপথে বিক্ষতচরণ।
একা নারী পথে।
কোমলতম আর দৃঢ় পদক্ষেপে
হৃতমানা পৃথিবীর বুকে,
জানি সে-ও
নারী একাকিনী পথে।

জোনাকির জন্য

কাঁদে না আমার মন
ভবিষ্যতের সুবাসে ভরা অতীতের জন্য,
অথবা সত্যিকারের বাতচক্রের
হাওয়ায় ঘুরপাক খাওয়া কাঠের পাখার জন্য
এমনকি সেই যৌবনমণ্ডিত হাতের জন্যও নয়
ডুব দিত যে আমার ঘন চুলে।
জোনাকির জন্য শুধু বেদনা আমার।

কি করে তাড়ালাম বলো জোনাকির দলে ?
হয়তো বা মোটরের তীব্র আলোকে
তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বেঁধা রাত্রির বুকে,
অথবা বিজলীবাতির ছায়াপথে ?
নয়তো বা বায়ুমণ্ডলের স্তরে
সূক্ষ্মানুভূতি তাদের রাডারে পড়েছে ধরা
আতঙ্কের বিদ্যুত তরঙ্গ
আমাদের স্নায়ুর তারে তারে।

হঠাৎ একটা জোনাকির দেখা পেলাম
কিশলয় ছায়ার অঁাধারে
বিদেশী পর্যটকের মতো ঘুরে বেড়াতে।
তার আলোর মর্ম পৌঁছালো আমার কাছে
সংকেতের মতো
যৌবনের সবুজ তারা থেকে
প্রতিমুহূর্তেই যে চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

এই সব সংকেতবার্তা একদিন গ্রহণ করতাম
আমার রক্তের স্পন্দনে,
মানে বুঝতাম প্রতিটি চিহ্নের
তুমুল বৃষ্টির দিনে তাদের নিরাশা
অথবা কোকিলের প্রাণের জোয়ার,
বাঙ্ময় শিহরণে জবাব দিতাম,
কিন্তু আজ আর বুঝতে পারিনা আমি।

হারিয়ে ফেলেছি সেই সংকেতলিপি।
কখন, কোথায়, হারালাম কেন ?
যদি জানতাম কোথায় খুঁজবো,
যদি জানতাম খুঁজবো কেমন করে,
পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতে আমি রাজি
যদি খুঁজে পাই সেই সংকেতলিপি,
ডাকবো আবার তবে অন্ধকারে জোনাকির দলে।

রাতের বদলি

অনেক উজ্জ্বল দিনের কথা ভুলে গেছি আমি।
কিন্তু মনে আছে আজো সেই সব সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত।
একটি লণ্ঠন ঝোলানো গাছের ডালে,
আর তাকে ঘিরে তুষার-ঝড়ের মতো পতঙ্গের স্রোত।

কালো পাথরের পাহাড় খুঁড়ে চলেছি আমরা
আঁধারকে চূর্ণ করবার সরল বিশ্বাসে।
টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিই পাতালের দিকে
গড়িয়ে যাওয়া আঁধারের প্রতিধ্বনি জাগে।

রাত্রিকে করেছি ভেদ টানেলের মতো,
ঊষা-সমাগমে ক্লান্ত হাতে অন্তিম আঘাতে
খুলে দিই দ্বার দিনের আলোর,
পৃথিবীকে ঘিরে হেসে ওঠে নতুন আকাশ।

সেই রাতের লণ্ঠন আছে এখনো আমার কাছে,
নেভায় নি কেউ তাকে, জ্বলছে সে দিনের আলোয়।
কিন্তু হাস্যকর কতো, এবং করুণ
পতঙ্গও আসে না এখন তার আশেপাশে।

মাকে লেখা চিঠি

মা গো তুমি ভেবো না আমার জন্যে।
তাণ্ডবের শেষে নিস্তব্ধতা নামে,
মহাশূন্যে শুনি আমি
তোমার হৃৎপিণ্ডের উদ্বিগ্ন স্পন্দন
প্রতিধ্বনি জাগে যার তারার অসীমে।

কেবল আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।
ওপারে জোনাকির দল হয়েছিল জড়ো।
শিশুরা চলেছিল স্কুলে
নারকেল-মালার বাতি নিয়ে হাতে।
কিন্তু জেটের মৃত্যু ছোঁ মারলো তাদের মাথায়।

আমার জন্যে একটুও ভেবো না তুমি।
ঝড় থেমে গেলে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলাম।
এমন নিকষ কালো ছিল সেই অন্ধকার রাত
একটি জোনাকিও বুঝি দিত ভরে দিনের আলোয়,
কিন্তু হায়, একটিও ছিল না কোথাও।

মা গো তুমি ভেবো না আমার জন্যে,
বোমা যদি আমার নাগাল না পায়, দেরী করে
বিস্ফোরিত হবে জানি হৃদয়ে তোমার।
তাই হবে একমাত্র জোনাকির আলো
এই ধর্ষিতা, দৃষ্টিহীনা অন্ধকার রাতে।

(ভিয়েতনাম—১৯৬৮)

নেভেনা স্তেফানোভো ॥ ১৯২৩ ॥

সৌজায়া

ঈর্ষাভরে প্রত্যহ অপেক্ষা করেছি,
ক্ষেত খামার পাহাড় পেরিয়ে,
আকাশের দেখাশুনো সেরে,
সকলের সাথে সাক্ষাতের শেষে,
ভারা বেয়ে বেয়ে উঠে
তার স্বর্ণকিরণে
নির্মীয়মাণ ইমারতের মাপ জোক ক'রে,
ঝর্ণার স্ফটিক জলে
চোখ ধুয়ে,
মেয়েদের সাথে খুনসুটি সেরে...
অবশেষে
আমার ছোট্ট ঘরে আসবে সে...

কেন আমি এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছি
অন্ধকার ঘরে ?
আজ তড়িঘড়ি তাই, বাইরে বেরোতে চাই
সূর্যোদয়ের আগেই।
আমাকে নজর করেছে সে।

আলো দিলো তাই সারাদিন ধরে।
সন্ধ্যেয় আমাকে বাড়ী পোঁছে দিল,
আলিঙ্গন পাশে আমায় চুম্বনে ভরালো।
শ্রান্ত ছিলাম বড়ো, তবু হৃদয়ে খুশির ফোয়ারা—
আমার সাথেই এলো সে অন্দরে, থেকে গেল ঘুমে।
আর ঘুমের ভেতর—সুকন্যার মতো
আমি তাকে সর্বস্ব দিলাম।

মুহূর্ত

তুমি ছিলে অনেক দূরে, জানতে না কোথায় আছি আমি,
আর আমি ডাকবাংলোয় রাত কাটাচ্ছি পর্যটকের মতো—
আমস্টারডামের কোনো হোটেলের পেছনের একফালি আঙিনায়
ব্যারাকের মতো নীচু নীচু ঘর,
অজস্র খালের ঘন জালে ঘেরা।
বিশাল বন্দর থেকে ভেসে আসে জাহাজের তীক্ষ্ণ সাইরেণ
আর বাঁধের ওপর দিয়ে যাওয়া-আসা করে
মধ্যরাতের ট্রেন বিকট গর্জনে···
ভালো থাকা না থাকা অবান্তর পথিকের কাছে
যেখানে অস্তিত্ব বজায় রাখা, অনেক চিন্তার পরেও
অত্যন্ত আপেক্ষিক।
এখানে বসেই শুনতে পাবে তুমি সারা দুনিয়ার কণ্ঠস্বর
—বাস্তব এবং বিমূর্ত একই সাথে।

এই মুহূর্তে মনে হলো, আমাকে খুঁজছো তুমি
তোমার চিন্তায়, অশান্ত হৃদয়ে।
আমাকে দেখতে চাইছো পারীতে,
'আবেসে'র ভূগর্ভ-ষ্টেশনে বার বার ওঠো নামো
কেননা জানতে শুধু পুরোনো ঠিকানা
মন্টমার্তে, যেখানে থাকতাম আমি এককালে।

হয়রান যাতে না হও অনেক খুঁজে খুঁজে,
মুহূর্তেই তাই উড়ে চলে যাই
খাল পেরিয়ে

ফ্লাণ্ডার্সের বিশাল প্রান্তর,
জার্মানী,
অস্ট্রীয়া ছাড়িয়ে
পৌঁছে যাই বলকান পর্বতের দেশে
তার তির্যক ভুরুর পাশ দিয়ে,
না থেমে,
সোজা এসে সোফিয়ার আকাশে,
ঢুকে পড়ি আমাদের ছোট্ট বাড়ীটাতে...
বিছানায় তুমি তখন পাশ ফিরছিলে,
ঘুম তোমার মুখ থেকে
লেগে থাকা উদ্বেগের চিহ্ন
সরাতে পারেনি।
তোমাকে আদর করলাম, কিন্তু জাগাই নি,
কেননা ভালো করেই জানি
আমাদের এ সাক্ষাৎ
টিকবে না বাস্তবের ধোপে...
তোমার কপাল থেকে তিনটে বলীরেখা সরিয়ে দিলাম
আর তোমার কানে কানে বললাম কয়েকটা কথা।
দীর্ঘশ্বাস পড়লো তোমার।
আর সেই মুহূর্তেই
ফিরে এলাম ডাকবাংলোয়।
ভোর হবার আগেই,
হল্যাণ্ডের ঘন কুয়াশায়।

বোজিদার বোজিলোভ ।। ১৯২৩— ।।

আবর্ত

আসবে বসন্ত, হবে তার অবসান।
ছিলাম তরুণ। এখন আর নই। বুড়ো হবো।
তারপর মরে যাবো। রবে না কিছুই
তোমার আমার, শুধুমাত্র
সেই সব কবিতার ছত্র ছাড়া, যার মাঝে
আসবে বসন্ত, হবে তার অবসান,
আবার তরুণ হবো, বৃদ্ধ তারপর,
মৃত্যু অবশেষে, রবে না কিছুই,
কিছুমাত্র তোমার আমার
একমাত্র ভালোবাসা ছাড়া।

হয়তো তাই

চিরযৌবনা তুমি, তাই বুঝি আজ
দিয়েছো ফিরিয়ে মুহূর্তের তরে আমার যৌবন ?...

আবার আকাশে নামে ফাগুনের সাঁঝ।
ফুল তুলে আনি আমি ঘুরে মাঠ বন।

শিশু আমি, সমস্ত অন্তর ভরে ওঠে গানে,
নিষ্পাপ মুখ তুলে ফুলেরা তাকায়।
জানি আমি সুদীর্ঘ জীবনে
প্রদীপ্ত হবো আমি শত শত সূর্যের আলোয়।
এমন হালকা, বর্ণোজ্জ্বল এ বক্ষপিঞ্জর !
এমন সুখোষ্ণ সন্ধ্যা শান্তিসুধাময়,
তৃষার্ত বুক ভরে নিয়ে নিঃশ্বাস নিথর
চিরতরে রাখি ধ'রে রক্তকণিকায়...

হৃদয়ের সব ব্যথা নিমেষে মিলায়,
রূপালী কোমল প্রাণ উদ্দীপ্ত মুখর।
সুখী আমি তাই আজ আমার চিন্তায়
অর্থহীন গোণা, কতোদিন তোমার ও-চোখ থাকবে আমার
আমাকে দেখেছে সে চোখ, এই তো যথেষ্ট।
শুনেছি তোমার স্বর, এই তো অনেক !
ইন্দ্রজাল-বলে যেন উর্ধ্বে চলি ছাড়িয়ে ভূপৃষ্ঠ
তারাভরা আকাশের নীলে, তীব্র গতিবেগ !

রাদোই রালিন ॥ ১৯২৩— ॥

একটি ঘটনা

ছোট্ট পার্কটাতে
ঢুকল অনেক লোক।
সভা শুরু হলো, তারপরেই শেষ।
সবাই সারল দু'কথায় বলা।
আর বলবার ছিলই বা কি?
পনেরোটি সাদা কফিন, সকাল,
আর তিরিশটি কালো রুমাল,

পনেরোটি সাদা কফিন।
রক্ষে, ডালা বন্ধ সবগুলোরই।
প্রাণ যারা দিল তাদের দেখতে
কাড়াকাড়ি করি আমরা অজান্তে।

তারপর, তৈরি ছ'ফুট গর্ত;
মুঠো মুঠো মাটি,
কান্না
গলা-ঠেলে উঠে-আসা,
চোখের জল, স্নায়ুর তন্ত্রীতে ঠাসা—
সবকিছু মিলে একাকার
কৃমিকীট আর অন্ধকার।
পনেরোটি কালো কফিন চলে গেছে দৃষ্টির আড়ালে,
ছিল তারা স্বজন, সাথী সহোদর,
তারি সাথে সংগ্রামের এক অংশ দিলাম কবর।

ছোট্ট পার্কটি ক্রমে জনশূন্য হলো।
রয়ে গেল শুধু ত্রিশটি রুমাল কালো।

জন্মগত অধিকার

নিঃসঙ্গ একটি দ্বীপ সাগরের বুকে !
একখণ্ড শিলা যেন আশ্চর্য ঔদ্ধত্যে
শতাব্দীর ঊর্মিমালা তুচ্ছ ক'রে উর্ধ্বে মাথা তোলে,
বৃথা তার চারিদিক ঘিরে
নিরন্তর ঢেউ-এর আঘাত,
কখনো বা ফুলে ফুঁসে ওঠে ঝড়ে ও তুফানে,
তবু এতদিনে কখনো পারেনি তাকে
নিমজ্জিত করে দিতে সাগরের জলে।

নিঃসঙ্গ একটি দ্বীপ সাগরের বুকে,
সাহস করেনা কেউ থাকতে সেখানে,
ভৌগোলিকের দল তাকে হিসাবে ধরে না
পাশ কেটে চলে যায় সমুদ্রী জাহাজ,
মনে হয় অসীম সাগর মাঝে
ভাসমান যেন কোনো অনিশ্চিত ভেলা,
তবু তার অস্তিত্ব অটল,
তুচ্ছ ক'রে তরঙ্গের রোষ,
ঘোষণা করে তার নিজ অধিকার,
পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে
বিঘোষিত করে অধিকার তার
শিখর হবার।

দাভিদ ওভাদিয়া ॥ ১৯২৩ —॥

নিভে যেতে দিও না ঘৃণার আগুন

নিভে যেতে দিওনা ঘৃণার আগুন,
রোষ যেন শান্ত না হয়!

যে ঘৃণা জড়িয়ে আছে তোমার জীবন,
যে আগুনে পোড় খায় তোমার যৌবন···
আমার এ ঘৃণা সব মালিকের প্রতি
স্থূলকায় গর্বোদ্ধত ক্ষমতা-আসীন,
বিষধর সান্ত্রী আর সেপাইয়ের প্রতি
বিশ্বাসঘাতককে যেন ভস্ম করে ঘৃণার আগুন।
ঘৃণা মোর সেই সব উদাসীন হৃদয়ের প্রতি
বিদ্রোহের বহ্নিশিখা যার মাঝে ওঠে নাকো জ্বলে,
ঘৃণা মোর সেই আতঙ্কিত সুবোধের প্রতি
এমনকি প্রতিবাদহীন সেই সব ক্রীতদাস দলে···
এ ঘৃণার আগুন যেতে পারে নিভে
স্বাধীনতা আর নূতন জীবনে,
নির্মল আকাশে অকলঙ্ক দিনে।
কমনীয় প্রেমের মধুর কূজনে···

নিভে যেতে দিওনা ঘৃণার আগুন,
রোষ যেন শান্ত না হয়!

প্রেমের সুযোগ নেই শান্ত অবসরে,
খুশীমতো কাজ করা, উৎসবে মেতে।

আমরা সৈনিক, যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছি সারে
ক্ষমাহীন যুদ্ধে লিপ্ত শত্রুর সাথে!
পোর্ট সৈয়দ, বুদাপেস্ত আমাদের স্মৃতিতে ছড়িয়ে
চিতার আগুন আর শিশুদের শব!
এই সব পৈচাশিক দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে
উদ্বেলিত ঘৃণা আজ হৃদয়ে সরব···
আমরা সৈনিক—তাই পৃথিবীকে যতদিন
করবে কলঙ্কিত অত্যাচারী ধনাঢ্য বণিক,
বইবে রক্তের স্রোত, শোনা যাবে মৃত্যুর মর্মর,
যতদিন নূতন দাসত্বের ত্রাস রবে বর্তমান,
যতদিন পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না ধরায়—

নিভে যেতে দিওনা ঘৃণার আগুন,
রোষ যেন শান্ত না হয়!

মৃত্যুদণ্ডাদেশ

মাথার উপরে ঝুলে আছে মৃত্যুদণ্ডাদেশ।
মোম-মাখানো মসৃণ একটি দড়ি
তৈরি আছে গলে যেতে আমার গলায়।
একটি বুলেট, নির্দয় নিষ্ঠুর,
স্থিরলক্ষ আমার হৃৎপিণ্ডের দিকে।
ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়ীর আনাচে-কানাচে,
দুর্গম বনে-বাদাড়ে আমার পথের দিশা,
মৃত্যুর কথা চিন্তা করবার ছিল না সময়।
বন্ধুর পথে পথে বৃষ্টি আর ঝড়
যত্নভরে মুছে দিত পদচিহ্ন মোর।
পেরিয়েছি কতো কর্দমাক্ত পথ, কতো মাঠ,
কতো অন্ধকার হিমেল রাতে বেরিয়েছি পথে—
যতোই অবিশ্বাস্য শোনাক না কেন—
জয়ের চিন্তা—তাও আসেনি মাথায়।
কখনো ছিলাম না আমি এমন স্বাধীন
যেমন ছিলাম এই ভয়ঙ্কর দিনে,
মাথার উপরে নিয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ।

পাভেল মাতেভ ॥ ১৯২৪— ॥

স্বদেশ

আমি ছিলাম ছোট্ট একটি ছেলে,
তৃষ্ণার্ত, খাঁটি মানুষ।
মজুর নওজোয়ান সংঘের সভ্য ছিলাম বয়স যখন ষোলো।
তুমি আমার সবকিছু ছিলে,
তুমি ছিলে প্রথম দিবস,
তুমি ছিলে অন্তিম সন্ধ্যা,
আমার স্বদেশ।
তখন আমি আশ্চর্য হয়েছি
সেই কবির প্রশ্নে
বেদনাহত স্বরে যে করতো জিজ্ঞাসা :
"কি তুমি ?"
যেমন প্রথম প্রেম,
আহ্বানে তার
করে না কেউ প্রয়োজনহীন প্রশ্ন উত্থাপন।

সমস্ত দেহ জুড়ে স্বপ্নের আগুন,
তোমার ধ্যানে মগ্ন আমার জীবন,
প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, শপথ করেছি, পথে নেমেছি…
কিন্তু পৃথিবীতে অনেক আগেই—
স্বপ্নের আগুনের
প্রতিটি অঙ্গার হিম হয়ে গেছে…

তুমি আমার সব কিছু ছিলে ;
তুমি ছিলে প্রথম দিবস,
তুমি ছিলে অন্তিম সন্ধ্যা,
আমার স্বদেশ।
সবকিছু তুমি এখনো আমার ঃ
আমার কবিতা, আমার দিবস,
কিন্তু সব স্বপ্ন আজ যত্নে পরিণত।

বলেছি অনেক কথা
গেয়েছি মাত্র কয়েকটি গান,
ভবিষ্যতে থাকবে হয়তো অনেকের মনে।
ক্ষমা কি করবে তারা
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পথে যেতে যেতে
কখনো বা শঙ্কায় কেঁপেছে বলে বুক ?

মা গো আমার অপরূপা,
আমার চিন্তা, আমার বেদনা,
আমার ভাবনা, আমার বিশ্বাস,
আমার স্বদেশ।

আকাঙ্খা

শান্তির অর্থ হলো মৃত্যু, নিষ্প্রাণ
বেঁচে থাকা যেন পুরানো তৈজস,
অন্ধের মতো আঁকড়ে থাকা মিথ্যা জীবন—
নিভে গেছে চোখে অন্তিম আলোর রেশ।

কিন্তু আমি এখনো বেঁচে আছি, আছে তাও
যার জন্য ব্যথা পাই, লড়ি, আছে স্বপ্নের খেয়াল,
আমার উৎসবের পক্ষে অপরিসর বড়ো
রুদ্ধ ঘরের এই চারটি দেয়াল।

আমি ·হতে চাই ঝড় উদ্দাম উত্তাল,
তীব্র বেগে নিরন্তর যেতে চাই ছুটে,
সত্য আর ন্যায়ের কৃপাণের ধাতু হবো আমি,
সূর্য রশ্মি হবো, মৃত্যু যদি হয় হোক দিগন্তের পটে।

ছায়া আমি হতে চাই প্রান্তরের বুকে,
বসন্তের সবুজ শিরীষ নূতন ঘাসের,
রোদ্দুরে পোড় খাওয়া ডানার পালক
মহাশূন্যে উড়ে যাওয়া দুরন্ত বাজের।

হতে চাই পদক্ষেপ, বিশ্বাস, পথ প্রগতির
সবাই মিলেছি মোরা আহ্বানে যার,
হতে চাই একখণ্ড সূতো আমাদের লাল পতাকার,
যে পতাকা আশা আজ সারা দুনিয়ার।

এমন অন্ধকার রাতে

এমন ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাতে
দেবদূতেরাও ভয়ে কাঠ।
ঘুমোনো যায় না এমন রাতে
চোখে শুধু ভাসে স্বীকারোক্তির স্বপ্ন।
…চলেছি আমরা রুক্ষ মাটির বুকে
যেথায় কেবল মেরুদেশের শূন্যতার বাস
নিভে যাওয়া ঝাড়বাতির নীচে
উৎসবের কোলাহল অবসানে।
আমাদের পিছু পিছু আসছে না কেউ,
কেননা এখানে ছায়া নেই কোনো
অশান্ত আমাদের কণ্ঠস্বর যেন
বিষাদের প্রতিধ্বনি তোলে অতল গহ্বরে।
নিস্তব্ধ হরিণ অরণ্য
তাদের সবুজ সমাধিতে।
আর মাঝপথে আমাদের অনুভূতি
খুঁজে বেড়ায় স্বীয় অবস্থান।
আমরা কোথায় ?
এটা কোন দেশ,
কোন স্বয়ংক্রিয় প্রদেশে এলাম
যেথায় রাস্তার থামে থামে
সারি সারি পবিত্র পতাকা ?…
উঃ, অসুস্থ মনে হয় আমি,
সত্যিই অসুস্থ…

গেওর্গি জাগারোভ ॥ ১৯২৫— ॥

জবানবন্দীর শেষ

দু'পা সামনের দিকে, দু'পা পাশে
বরফের চাঁই দিয়ে তৈরি যেন মেঝে।
হাত বাড়ালেই—দেয়াল,
দাঁড়ালে সোজা হয়ে ছাদ।

তবু আছে বিস্তীর্ণ—উন্মুক্ত প্রান্তর।
সুগভীর নদী,
        পর্বতের প্রতিধ্বনি।
আকাশ
        আর পাখির ডানার ঝাপটানি
আর পথ,
যে পথ চলে গেছে বহুদূরে।

আছে দেশের সীমাহীন বিস্তার,
আছে প্রাণের বন্ধু,
চোখের স্বপ্ন।
আছে আরো, ছোট্ট একটু স্থান,
        এতটুকু জমি দু'হাত চওড়া
যেখানে দাঁড়িয়ে সবকিছু বাঁচাবার
        চরম প্রতিরোধ।

বসন্তের আগমনী

পাখির ঝাঁক।
পাখির ঝাঁক।
পাখির কাকলি।
গান করে পাখিরা।
কিন্তু কেন ?
দীর্ঘদেহ
পপ্‌লার,
দেখ তাদের—
এখনও জমে আছে নগ্নদেহ।

মাঠ ঘাট
সব কালো,
পাহাড়ের গায়ে
তুষারের শুভ্রতা,
নির্ঝরিণী
এখনো নির্বাক।
শীতকাল
এখনো এখানে।

কেন তবে
পাখির কাকলি ?

হয়তো বা
কাল রাতে
বৃষ্টির কলতান
জেগেছিল বলে !

হয়তো বা
কাল রাতে
মেঘেরা
নেমে এসেছিল,
তুষারের স্তূপ
কমে গিয়েছিল
আর জমাট বরফের বুকে
চিড় ধরেছিল বলে।

নূতন কিছুর
আগমনী গান
এখানে
পাহাড়ে পাহাড়ে
উপত্যকায়'
বাগানে বাগানে,
অলিতে গলিতে
কিছু শক্তিমান
আর সজীব,
নির্মল
আর নূতন
জন্ম নিচ্ছে।
মাথা তুলছে,
আত্মপ্রকাশে।
কিন্তু কোথায় তারা।
কোথায়?

পাখির ঝাঁক।
পাখির ঝাঁক।

গান করে
পাখির ঝাঁক।
সঙ্গতিহীন
অনুপ্রাণিত পাখির ঝাঁক।
তারা ওকে দেখছে,
অনুভব করছে
মাটির
আর জলের,
রাত্রির
আলোর
শব্দহীন শিল্পে,
নব কিশলয়ে,
উদ্বেলিত হৃদয়ে···

একটু একটু ক'রে
উষ্ণতর হচ্ছে দিন।

পাখিরা আশাবাদী—
কাকলিতে ভরে চতুর্দিক।
ভরুক না,
করুক না গান!

বললাম, বিদায়।
তাই যখন ঠিক করেছো—
ভালো...
সাগর গর্জে চলে প্রচণ্ড প্রমত্ততায়,
এই কৃষ্ণ-সাগর কালো।

প্রিয়া,
দেশান্তরী সমুদ্রচিলের মতো
তোমার সাথে হয়েছিল দেখা
হঠাৎ এখানে।
আর তারার চুমকি—
কতো অগুন্তি তারা,
ঝরে পড়েছে আমাদের মাথায় প্রতিটি সন্ধ্যায়···
কিন্তু পৃথিবী পরিবর্তনশীল,
চেয়ে দেখ—বালুকাবেলায় চিহ্ন দুটি
মুছে গেছে
নিশ্চিহ্ন হয়ে।
শেষ কথাগুলো মিলায় দূরে,
না-বলা কথা,
আগের মতো।

হেমন্ত,
হেমন্ত,
এই পথে গেছে চলে
ছড়িয়ে দিয়ে হলুদ পাতার রাশি।

ধরা পড়ে গেছি আমি।
শাস্তির নির্দেশ।
জানি, মরবো আমি
ভালোবাসার চিতার আগুনে।

হাওয়া বয়,
গুল্মের কাঁটা পায়ে-পায়ে বাজে।
দিকচক্রবাল জহ্লাদের মতো
মুখোশে মুখ ঢাকে।

কেউ কাঁদছে।
কেন কাঁদছে?
কান্না অর্থহীন।
মিশে যাই আমি রাতের আঁধারে।

আমি জ্বলছি।
ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে মিলিয়ে যাই, যেমন মিলায়
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত পিশাচ,
যেমন হারায় ছোট তরীখানি
দোল খেতে খেতে অতলে,
অন্ধকারে যেমন হারায় তীর।

বললাম বিদায়।
তাই যখন ঠিক করেছো
ভালো…
বিদায়, বিদায়!
সাগর গর্জে চলে প্রচণ্ড প্রমত্ততায়,
এই কৃষ্ণ-সাগর, কালো।

ভতো রাকোভস্কি ॥ ১৯২৫— ॥

বসন্ত

প্রকৃতির বুকে জমে ওঠে চাঞ্চল্য—
দৃষ্টির বাইরে, মাটির নীচে, অশ্রুত।
ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা ? অথবা ভূকম্প !
ভোরের এই স্ফটিক মুহূর্তে
বাইরে থেকে একটি হাত ঘুরিয়ে দিল
পৃথিবী, রাস্তাঘাট আর মহাকাশ,
সাদা ফুলে ভরে উঠল পথের ধারে গাছের শাখা,
আঙ্গিনাতে ডুমুর গাছে লাগল প্রাণের ছোঁয়া,
ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে
সাজিয়ে দিল সারা দেহ কুঁড়ির সম্ভারে।
কুঁড়ের তির্যক চালের নীচে
সদ্য হেঁটে যাওয়া মানুষের পদচিহ্ন।
দরজা বার বার খোলে, বন্ধ হয়,
কুয়োর কপিকলে কর্কশ আওয়াজ,
চিড় ধরে কাঠের সিঁড়িতে।
দুয়ারের ধারের ফালিতে
পেঁয়াজের সবুজ চুলে কাঁপন লাগে।
কাগজের যে চরকিটা নিয়ে
বাচ্চারা খেলছে বারান্দায়,
ভোঁ ভোঁ ঘুরছে সেটা উন্মাদের মতো,
মনে হয় মুহূর্তেই পাড়ি দেবে অন্তরীক্ষে।
কি যে হলো ? যে সাইকেলে যায়, সেও
বাঁধনছেঁড়া বেগে পেডাল চালায়।

নাসপাতি গাছ চেরী গাছের সাথে খুনসুটি করে
কুকুরটা ডেকে চলে···কপিশ দিগন্তে
জড়ো হয় মেঘ, উড়ে যায় পাখির ঝাঁক,
আকাশটা মাতালের মতো দুলে দুলে ওঠে,
ধাতব তারে তারে ঐকতান বাজে,
কপিকলের নীচে বালতিটা ছন্দে ছন্দে নাচে!
পৃথিবীটা যেন ঘুরছে অনেক জোরে।
গাছ-গাছড়াও যেন ছুটছে জায়গা ছেড়ে।
আর কুকুরটা—দেখো তাকে—বাঁধন কেটে
পাগলা হয়ে যেন ছুটছে মাঠে।

বাইরে বেরোই। পথ আমাকে নিয়ে চলে
তার উদ্দাম গতির টানে। একটি পপ্‌লার
শীর্ণ হাতে হাতছানি দেয়। হৃৎপিণ্ডে দারুণ স্পন্দন—
আর সমগ্র জগতের সোচ্চার ঘোষণা—বসন্ত!

পথিক

ভালোবাসি আমি সবুজ মুকুল
যা থেকে ফুটে বেরোয় ফুল,
নৈঃশব্দ, উষ্ণ শিহরণ,
বাতাস আর বৃষ্টি।
ভালোবাসি আমি ঘাসের সবুজ
আর মাটির বাদামী রং,
আর অন্তহীন পথ, রয়েছে ছড়িয়ে
যারা পৃথিবীর বুকে।
তবে ?
সবাই আমরা যাবো এই পথে,
চিরন্তন পথের পথিক।
শিশির-ভেজা বটের পাতার ডাল
ভেঙ্গে নেবো হাতে।
করবো পান ঝরণা থেকে জল,
পৃথিবী থেকে একপাত্র বাতাস,
প্রেয়সীর কাছে পাওয়া—প্রথম-শিহরণ,
আর গাছ থেকে ফুল।
ভালোবাসা আর বৃন্তচ্যুত ফুল
একদিন শুকাবে আমাদের কাছে।
প্রেমে পড়বো, যখন অনেক দেরী হয়ে গেছে,
বিশ্বাসের পাত্র হবো—আর আমি ?
আমি সেই পথিক, যে পথ চলে
শুকনো এবড়ো-খেবড়ো মাঠে,
জাহাজে ভাসে, বিমানে ওড়ে
অথবা পা ডুবিয়ে দেয় ঘাসে।

তাই আশীর্বাদ করি আকাশকে
আর জীবনকে, যার তরে দেবে প্রাণ
বীরেরা এবং ফুলেরা দুইই
অতর্কিত মৃত্যুর কবলে।
তাই আশীর্বাদ করি পৃথিবীকে,
শস্যকণা আর গমের শীষকে,
আর সেই মহান সঙ্গীতকে
যে বেঁচে থাকবে আমাদের পরেও।

শোপ্যাঁর জন্য একটি গাথা

প্যের লাশেজ।
শোকার্ত সমাধিস্থান।
পৃথিবীতে সব থেকে মর্মান্তিক স্থান...
শীতল বেদীর পরে
শ্বেত-পাথরে গড়া
পেলবাঙ্গী মেয়ে
কাঁদছে শোপ্যাঁর শোকে।
শোকবস্ত্র পরিহিত সাইপ্রেস গাছে
বিলাপের মর্মর।
স্মৃতিফলকের নীচে নীচে
ওয়াটারলুর বীরেরা ঘুমায়।
হেমন্তের তারারা জ্বলে
অসংখ্য প্রদীপের মতো।
নিস্তব্ধ।
আকাশের অন্তঃস্তল থেকে
দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে।

কে জাগাবে মেয়েটিকে ?
কে তাকে সান্ত্বনা দেবে ?
কে তাকে বলবে,
ফ্রিজেক শুয়ে নেই সমাধির নীচে,
পছন্দ হয়নি তার অন্ধ জগৎ,
মাটিকে বিদায় জানিয়ে তাই

বীণাখানি হাতে নিয়ে
গেছে চলে পৃথ্বী পর্যটনে,
স্বরলিপি-রেখা পথে পথে
সেই দেশ পানে
যেথায় প্রাচীন ছন্দের মাঝে
মহান সঙ্গীতের সুর বাজে···

কিন্তু এক নিদারুণ অভিশাপ
শান্তি দেয়না তাকে—
মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে
তার বীণার ঝংকার,
মাজুরকার তালে তালে নাচে তারা
উদ্দাম ঝড়ের আবেগে।
ব্যরিকেডে ব্যরিকেডে দেয় প্রাণ
"বিপ্লবী সঙ্গীতের" সুরে সুরে।

অঞ্জলি ভ'রে ভালোবাসা তাকে দিয়েছে পৃথিবী
আর মাত্র এক দণ্ডাদেশ—
যুগ যুগান্তের অমরত্ব
পাবে এই প্রতিভা অশেষ।

স্বপ্ন

অপ্রত্যাশিত ভাবে
কাল রাতে স্বপ্ন দেখলাম
(বিভীষিকাময়
দুঃসহ ছিল সে রাত)
পৃথিবী
আর মানুষের সাথে
শেষ
বিদায়ের ক্ষণ।

ছিল
সুচীভেদ্য
কালো অন্ধকার,
একরাশ
ফুলহারে সেজে
অপেক্ষা করছিলাম
অশরীরী আত্মা
অনন্তের সাথে
মিশে যাবে বলে।
কিন্তু মাটি,
ঠাসা যাঁতাকলের মতো
ধীরে ধীরে
দেহকোষকে
পরিণত করছিল
ধূলিকণিকায়।
ভীষণ আতঙ্কে চোখ খুলে
চিৎকার করে উঠি :

"হে মানব
নবরূপে ভালোবাসো পৃথিবীকে ।
সাজাও তাকে
সৌন্দর্যে আর প্রজ্ঞায়,
নতজানু হয়ে
বসে তার কাছে
শোনাও তাকে
মধুরতম কথা
তোমার অন্তর থেকে ।

গ্রহণ করো তাকে
তার অসীম উদ্বেগে,
তার বেদনাতে,
তার তীব্র রোষে···
প্রদীপ্ত করো তাকে
তোমার আবেগে, সন্দেহে
আর ঐকান্তিক প্রেমের আগুনে···

অজানা পথে পথে
পথ চলো
নতুন করে আবিষ্কার করো
নিজেকে আর পৃথিবীকে···
আহা,
উৎসব করো
বেঁচে আছো ব'লে,
পৃথিবীর মাটি
এখনো পায়ের নীচে ।

ইভান দাভিদকোভ ॥ ১৯২৬ ॥

মনে হয় আমারি জন্যে

মনে হয় আমারি জন্যে
হেমন্ত এমন স্বচ্ছ,
সারা নীপার নদী এমন উজ্জ্বল
সোনালী জপমালার মতো
বুকে নিয়ে ছোট ছোট পাতার দ্বীপ
আর ম্যাপেলের ফিসফিসানি।

...তবুও বকের পাঁতি উড়ে যায়
দানিয়ুব আর মারিৎসার পানে।

সঙ্গী ছিল গান আর উচ্ছল হাসির কল্লোল
ঝড়ের থেকেও বেশী ঐশ্বর্যবান।
অপরূপা নিজের কন্যাদের দিয়ে
এ শহর মন্ত্রমুগ্ধ করেছে আমায়,
তাদের কালো চোখের পাতার নীচে
নাচে সবুজ চোখের মনি।

...তবুও বকের পাঁতি উড়ে যায়
দানিয়ুব আর মারিৎসার পানে।
আকাশ জুড়ে বিশাল চাঁদ।
বিস্তীর্ণ স্তেপভূমি এমন পরিষ্কার
দেখা যাবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত।
দূরের পানে দেখি যদি চেয়ে
দেখতে পেতাম ভিটে-বাড়ির চালা
আর আঙুর-লতার ঝোপ।

...তবুও, আহা, বকের পাঁতি উড়ে যায়
দানিয়ুব আর মারিৎসার পানে।

এক যে ছিল ছবি-আঁকিয়ে

এক যে ছিল ছবি-আঁকিয়ে, একটু কেমন যেন,
ভাবত তাই বয়সে যারা বড়ো। আমরা ছেলের পাল
কৌতূহলী মনে যেতাম তার পিছে
দেখতে কেমন ক'রে
ন্যূব্জ দেহে চলতো সে পথ পটের বোঝার নীচে।

বন্দর ছিল তার
টিলা পাহাড়ের ঢেউ যেথায় তুলেছে মাথা,
নোঙ্গর ফেলত তার ত্রিকোণ পীঠিকা
এই বিশাল পৃথিবীতে।
আর একটি মুনিয়ার গান
ছিল তার একান্ত পারিষদ।

চাষীর আদুর গায়ে ব্যস্ত ক্ষেতের কাজে,
টান্ টান্ লাগামের বাগে হাঁপায় ঘোড়া,
আর সে ফুটিয়ে তোলে আলের রেখা
মেঘ আর আকাশ
তারার ফুলে ভরা।

জীর্ণ শালখানা জড়িয়ে নিয়ে গায়ে,
পাখির গানের সুরে তার হৃদয় ভরপুর,
ডাক দেয় সে গাছ-আগাছা পাতা ঝরায় যারা,
সবে এসে শীকর মেলে পটের উপর তার।

কষ্টেসৃষ্টে চলত সে পথ যখন যেত ফিরে,
নিজের পা মিলিয়ে দিত
নগ্নপায়ে ফিরত যারা ঘরে।
সহজ নাকি—
এতগুলো পাহাড় আর মেঘ বয়ে নেওয়া
নিজের হাতে ক'রে?...

শীতের সময় জানালা তার হ'ত যেন
একটি নোংরা দাগ।
বাইরে যখন হিমেল তুষার-ঝড়
করতো দাপাদাপি,
উঠত জ্বলে তখন যেন পটের উপর তার
মধ্যাহ্নের রবি
করতে গরম তার হাতের চেটো দুটো
আর নগ্ন গাছের শাখা।
কোথা থেকে আনলো তাকে?
রোষান্বিত আকাশ থেকে নাকি?
কেমন ক'রে—সেথায় তো নিকষ অন্ধকার,
বাতাস যেন ফোটায় বরফ-ছুঁচ।
নিশ্চয়ই সে লুকিয়ে রেখেছিল টুপির ভিতর তার,
যেমন করে বাচ্চা-ছেলেগুলো
লুকিয়ে রাখে চড়ুই পাখির ছানা...

এমন মানুষ নিজের তরে কিছুই রাখে না,
জোগায় আনন্দ অন্য সকলকে
আর তারই জীবন-রসে থাকে সঞ্জীবিত।
নিভে যাবার আগে জ্বালিয়ে যায় এমন অগ্নিকুণ্ড
উত্তাপে যার উষ্ণ হ'তে পারে
আগামী দিনগুলি।

সংগ্রহ করে না তারা
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুশীর কণিকা,
বিনিদ্র রজনী জাগে
মারা যায় যত্নহীন চোখের আড়ালে,
রেখে যায় অনুভূতি আর সূর্যের নক্ষত্রমণ্ডলী।

অরসিক লোকেরা
এসব কথা বুঝবে কেমন করে ?

দ্বীপ

আমার বাবা
ছিলেন কেরানী,
খেতেন তিনি
'আরদা' সিগারেট
আর পড়তেন মার্কস্‌,
অফিসে মেলাতেন
কারখানার হিসাবের খাতা,
উদাসীন ভাবে লিখে যেতেন
বেড়ে যাওয়া লাভের অঙ্কের বোঝা
আর
ক্ষীয়মাণ মজুরীর হার।
তারপর একদিন
বাস্তবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে
দুশ্চিন্তার ঘোরে
যাত্রী হলেন হাসপাতালের গাড়ীতে,
রেখে গেলেন
রং-চটা ফোটো একখানা
তাঁর মার্কস্‌বাদী সাথীদের
উনিশ শো পাঁচ সালে তোলা।

সবাই তারা তরুণ
সবাই ছিলেন ভালো
পরণে সবার ছিল সাদা জামা,

সবাই ছিলেন আমার কাকা-জেঠা,
ছবি তোলা একটি দ্বীপের মাঝে,
ঘাসে আর মানবতায় ঢাকা,
কোনো এক আদ্যিকালের নদীর কাছাকাছি
বিপ্লব যার নাম।

জাহাজীদের বদভ্যাসের মতো
তখন থেকে আমার জিজ্ঞাসা।
তখন থেকে আমি
খুঁজে বেড়াই মানচিত্রের পাতায়।

খুঁজে বেড়াই সেই দ্বীপের দিশা,
সেই দ্বীপের দিশা।

লিলিয়ানা স্তেফানোভা ॥ ১৯২৯— ॥

আছে আর নেই

এই বিহ্বল ব্যবধান
দুটি শব্দের মাঝে
আছে
আর
নেই।

দুই মেরু,
নিরন্তর পরিবর্তন করে
নিজ স্থান
আর আমাদের করে তোলে
কখনো দারুণ সুখী,
কখনো অপার দুঃখী।

তুমি আনন্দ পাও,
হাওয়ায় ভর ক'রে চলো,
নিঃশ্বাস নাও,
বেঁচে থাকো,
সমৃদ্ধ হও,
বয়ে বেড়াও শব্দটি
আছে।

আছে প্রেম,
আছে আস্থা,
আছে অমরত্ব।
আছে।

তারপর কোনো একদিন,
একটি অতি সাধারণ
দিনে,
অজান্তেই,
দৃষ্টিকে এড়িয়ে,
অনুভব করো তোমার কাঁধ ছুঁয়ে গেল,
কেবল স্পর্শ করলো
শব্দটি 'নেই'।

জানো তুমি আস্থা কা'কে বলে?
প্রেম বলে আছে নাকি কিছু?
কোথায় তারা?
কোথায়?
ধোঁকা!
সোজা দাঁড়িয়ে তখন
নিষ্ঠুর চোখে তাকায়
শব্দটি 'নেই'।

হে, দুটি শব্দের
ভয়ঙ্কর চক্র,
চাইনা স্বীকার করতে তোমার বশ্যতা,
অদৃশ্য যাত্রাপথ ধরে চাইনা ছুটতে

রাত আর দিন
তুষার আর হুতাশনের মাঝে।
আমি প্রতিরোধ করবো,
দৃঢ়স্বরে বার বার বলবো
আছে!

উপহাস ভরে তবু বলবে কোনো স্বর:
আছে? কি আছে?
আছে শৈত্য?
আছে বিশ্বাসঘাতকতা?
আছে ক্ষত?
ঘুরে দাঁড়িয়ে তখন খুঁজে বেড়াই অন্য শব্দটি:
নেই!
আমি ডাকি তাকে, অপেক্ষায় থাকি তার,
তাকে প্রার্থনা জানাই...
নেই!
অন্য এক আমার পৃথিবী,
নেই বিশ্বাসঘাতকতা,
নেই ঘৃণা,
নেই রাত্রি।
নেই।

যেয়ো না চলে, দিন

যেয়ো-না চলে, দিন
তুমি যেয়ো-না আমাকে ফেলে
এই সন্ধ্যার হিমেল আলিঙ্গনে,
দেখছো না—বিশ্রামের অধিকার নেই,—
রক্তিম সূর্যাস্তের কঠিন রেখার নীচে
লেখা হবে জমা-খরচের নির্দয় হিসাব।

গুটিয়ো না তোমার সাদা পাল,
আমাদের যেয়ো-না ফেলে—
প্রার্থনা করছে আমার সন্ত্রস্ত হাত,—
তালি দেওয়া ঘুমে কেন থেমে যাবো
অবক্ষয় যখন নামমাত্র শুধু,
আর এখনো অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে ?

অস্ত যেয়ো না তুমি ;
যেয়ো না ডুবে অন্ধ তমিস্রায়—
প্রার্থনা করছে আমার আতঙ্কিত চোখের মণি,—
কি করে ঘুমাবো ছায়াঘেরা চোখের পাতার নীচে,
যখন এখনো দেখার বাকী অঢেল অনেক
আর, ক্ষণিকের তরে শুধু ছিল দীপ্যমান আলোকের শিখা ?

আলোয় উদ্ভাসিত করো আমার আকাশ—
হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা,—

অতন্দ্র অংশীদার হতে চাই আমি
সব আনন্দের
সব বিষাদের,
সকলের সাথে ভাগ করে নেবো সুখ আর ব্যথা,
আমার আকাঙ্খা ঘিরে চলুক উৎসব,
অস্তগামী সূর্যরশ্মি দিগন্তের পটে
না যেন আঁকে আমাদের বিদায়ের ছবি।

ঘোড়ার লাগাম কেন টেনে ধরবো এখনি,
যেয়ো না তুমি চলে, এখনো অনেক দেরী ঘুমোতে যাবার,
এখনো অনেক দেরী, পাখিরা এখনো জেগে।
চলে যেয়ো না তুমি, অশান্ত হয়ে উঠছে আমার হাত—
দূরের পানে ছুটে যেতে চাই,
অনেক, অনেক পথ পার হয়ে যেতে চাই আমি!

জোড়ায় জোড়ায়

(যুদ্ধশেষে মস্কোর স্মরণে)

মেয়েরা নাচছিল জোড়ায় জোড়ায়,
পরণে তাদের সাদামাটা সুতির জামা,
পার্কের শান-বাঁধানো চত্বরে
নাচছিল তারা নিজেরাই
জোড়ায় জোড়ায়—
নেচে চলে তারা
যতক্ষণ না সারা পৃথিবীটাই দুলে ওঠে চোখে।
এক পা সামনে ফেলা—আবার পিছনে
প্রতিটি এপ্রিলের সন্ধ্যায়—
জোড়ায় জোড়ায়
মাঝ-রাত পেরিয়ে।
তাদের চওড়া-ঘের স্কার্ট
গোল হয়ে উঠছিল ফুলে,
কাঁপছিল যেন
বিষাদের ছোঁয়া-লাগা ফুল
হিমেল আকাশের নীচে।

ছেলেরা ঘুমিয়ে আছে
খারকভ্, ওরেল বা ঝিতোমিরের আশেপাশে
আচ্ছন্ন গভীর ঘুমে অনন্ত শয্যায়…
বেলোরাশিয়ার আদিগন্ত গমক্ষেতে
স্বপ্ন দেখে তারা
গোধূলি-আলোয়

ক্ষীণকটি মেয়েদের,
প্রাণহীন জনপদে
বিধ্বস্ত মৃত নগরীর পথে
নাচে তারা সাথে নিয়ে পেলব সঙ্গিনী
জীবনের প্রথম ওয়াল্যজ্‌...

রঙ্গীন স্কার্টের মেলা
গোল হয়ে উঠছিল ফুলে
শান-বাঁধানো পার্কের চত্বরে
নিজেরাই,
জোড়ায় জোড়ায়।
একমাত্র আমার সাথী ছিল
কৃষ্ণ কেশ যোয়ান পুরুষ
বুলগার একজন।
মেয়েদের আহত চোখের তারায়
বিদ্যুত ঝলকে জাগে প্রশ্ন ভয়ঙ্কর।
নাচের মাঝে মাঝে
পা ফেলার প্রতিটি তালে তালে
অগুন্তি বিস্ফারিত চোখের সম্মুখীন আমি।
দৃষ্টিতে তাদের ছিল
ভৎর্সনা, হিংসা
আর বুভুক্ষার ছায়া।
জোড়ায় জোড়ায়,
জোড়ায় জোড়ায়,
হিল-তোলা পা ফেলে নেচে চলে দানিয়ুব ওয়াল্যজ।
মনে হ'লো
কোনো এক ভীষণ অন্যায়ের
কারুকর্তা আমি,

কেবল আমার শীতল হাতে
হাত দিয়ে আছে এক বলিষ্ঠ পুরুষ।
একমাত্র আমি।
আর আমার সাথে সাথে
এক পা সামনে এগিয়ে, আবার পিছনে
তালে তালে পা ফেলে
একজোড়া পুরুষের জুতো।
ফিরে আসবে না আর সেই দিনগুলি,
অথবা আমার প্রথম নির্দোষ অপরাধ।
তবু যদি কানে বাজে আজ
দু'অক্ষরের শব্দ 'যুদ্ধ'—
মৃত্যু, জ্বলন্ত জনপদ, অথবা
ধ্বংসস্তূপে ঢাকা শহরের সারি
কিছুই দেখিনা আমি—
চোখে শুধু ভাসে—
পার্কের শান-বাঁধানো চত্বর
আর সেই মেয়েদের দল,
নিজেরাই চলেছে নেচে
জোড়ায় জোড়ায়,
জোড়ায় জোড়ায়।

হাত

হে আমার গ্রামের বোনেরা,
কোনো পুরুষের মাথাতেই আসবে না
চুমো খেতে তোমাদের হাতে
শহুের কায়দামাফিক,
আর তোমাদের হাত সব থেকে ভালো ঃ
যুগ যুগ ধরে এ-দেশবাসীকে দুলিয়েছো কোলে,
"ন'মাস ধরেছো তাকে পেটে
তিন বছর পেলেছো তাকে হাতে"
এ গান গেয়েছো তোমরা কতো।
বুনেছে এ হাত যব আর গম,
জ্বলে গেছে তামাকের কষে,
হেজে গেছে আঙ্গুরের রসে,
কড়া পড়েছে খড়ের আঁটি বেঁধে।
বিশ্রামের অবকাশ তাদের কোথায়
একমাত্র ঘুমের অবসর ছাড়া...
তোমাদের জীবন-চরিত পরিষ্কার পড়া যায়
তোমাদের হাতের পাতায়—
কোমল তোমার হাত নরম শিশুর চুলে,
কোদাল ধরতে হলে সে হাত লৌহকঠিন,
দা' আর হাঁসুয়ার কাটা দাগের ইতিহাস,
ঠাণ্ডা জলে ফুলে ওঠা আঙ্গুল,
বরফে হিমে ফুটি-ফাটা চামড়া...
না কারো মাথাতেই আসবে না
চুমো খেতে এমন হাতে!

এ হাতকে আদর জানায় বৃষ্টি আর মাটি,
সূর্যমুখী দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানায়,
ভেড়ার পাল সাড়া দেয় আহ্বানে তার···
যা কিছু জন্ম নেয় এ মাটির বুকে
এ হাত তাকে আশীর্বাদ জানায়।

হেমন্তের রূপকথা

গ্রীষ্ম শেষ হলো।
তন্বী কুয়াশা
অরণ্যের চিরুণী দিয়ে
আলস্যে চুল আঁচড়ায়।
গৃহহীন ছন্নছাড়া হাওয়া
সারারাত হুটোপাটি করে
দেবদারু গাছে।
গ্রীষ্ম গেছে চলে…
আজ রাতে কি যে করা যায়?
বেরুতে চায় না মন হিমেল হাওয়ায়—
কাছে বা দূরে—ইচ্ছে নেই কোথাও যাবার।
থাকো আমার কাছে!
শীতের দিনের মতো জ্বালবো আগুন,
গায়ে জড়াবো বড়ো শালখানা,
বসবো তোমার পায়ে
(লাল-চুলো বেদেও তো আছে!)
আর দেখবো তোমার হাত।

…ওগো বাবুমশাই
পথ যে তোমার বড়ো আঁকা-বাঁকা,
ভ্রমণ অনেক আছে হাতে লেখা
ডাঙ্গায়, জলে, দুইই,
হাঁটু ছড়ে পড়বে রক্ত ঝরে
এব্ড়ো-খেব্ড়ো চড়াই ভাঙতে গিয়ে,
তবে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে-নাকো…

কখনো বা হবে তুমি আকাশের চিল
কখনো বা পাখনা সব খসবে ডানা থেকে,
তুমি কিন্তু, বাবুমশাই, শক্ত ধাতে গড়া ঃ
হোঁচট খেলেও আবার দাঁড়াবে উঠে,
অমঙ্গল তোমা থেকে ছিটকে যাবে দূরে
যেমন যায় মুগুর লোহা থেকে।
সবকিছুই ঢুকবে তোমার মাথায়
যতোদিন না বরফ-ফুলের পরবে তুমি সাজ—
চিরদিনই বয়স তোমার অল্প থেকে যাবে
অনেক, অনেক মেয়েদের ভালোবাসা পাবে ঃ
একজন তো বসেই আছে পায়ে,
নেবে বুকে দু'হাত দিয়ে তাকে,
মনে হয় তার সবুজ চোখের তারা,
বোধ হয় তার চুলে আগুন জ্বলে…

হাতখানা নিও-না সরিয়ে।
চাই-না এখন আমায় আদর করো।
শুধু আঙ্গুল দিয়ে ছুঁতে দাও তাকে
অনুভব করতে দাও আমায়—
প্রেম আর শক্তির সম্ভারে ভারী,
যে হাত জানে না পরাজয়,
বাধ্য যে শুধু আমার কথায়—
তোমার উত্তপ্ত,
তোমার পুরুষালি হাত…

হাত দেখা শেষ।
আর আমার হাতের পাতায়
মোহরের বদলে তোমার দুটি ঠোঁট।

যখন ভিত গাঁথা হচ্ছিল

সূর্যাস্তের সাথে লোক জ্বলে খাক হবে,
পুড়ে যাবে স্মৃতি, অনুভূতি, স্বপ্ন ঃ
আঙ্গিনায় আকাশিয়ার ফুল ঝরে পড়বে,
মর্মর জাগাবে শাখায় সন্ধ্যার লগ্ন।

জীবন যা নেবার নেবে আমাদের থেকে
আনন্দে গাইবে গান ঝর্ণার সুরে,
উত্তরাধিকার নিতে যবে কিছুকাল পরে
আমাদের বংশধরগণ আসবে এ পুরে।

হৃদয়ে আবার জাগবে সঙ্গীত-লহর
পাখিরা আবার বাঁধবে নিজেদের নীড়,
তেমনি আবার, জানি, কোলেতে মায়ের
সোনার টুকরো শিশু হাসবে নিবিড়।

আবার ফুটবে ফুল অপরাজিতা
নীল নীল চোখে তারা তাকাবে আবার
এখানে তখন থাকবে অন্য জনতা
আঙ্গিনাতে হবে এক অন্য দিন ভোর।

ইতিহাস বলবে কি তার স্মৃতিকথা
অথবা নির্বাক রবে কিছুই না বলে,
কি ভাবে আশার অঙ্কুর তুলেছিল মাথা
সিঞ্চিত হয়ে আমাদের অশ্রুজলে…

সংগ্রামের ঝ'ড়ো পথে কিভাবে আমরা
ছু ঁড়েছি অন্তিম গ্রেনেড দুরন্ত সাহসে,
তারপর কিভাবে আমাদের আনন্দের ধারা
ভারা বেয়ে উঠেছিল শিখর প্রদেশে...

কি করে মাত্র পঁচিশ বছরে
আমাদের চুল সব হয়েছিল সাদা,
ছোটো-খাটো সুখ-চিন্তা ঠেলে রেখে দূরে
প্রতি ভোরে গেছি ছুটে তুচ্ছ করে বাধা।

আমাদের বংশধরগণ বৃথাই খু ঁজবে,
অবশেষে হয়তো বা জানবে না কেউ,
কি ভাবে কেটেছে তখন আমাদের দিন
চলছিল যখন হেথায় ভিত্তি-স্থাপন।

কতো বাধা এসে সব হয়েছিল জড়ো!
ঈর্ষার অতীত ছিল আমাদের ভাগ্য!
পল-দিন-যুগ থেকে বহুগুণ বড়ো···
সংগ্রামে বেঁচেছি মোরা, সংগ্রামের যোগ্য!

আমি জনতার একজন

স্বপ্ন দেখি না আমি
অমর হবার
অথবা কুসুমাস্তীর্ণ পথ,
কিংবা তূলোর গরম কোট
শীতে-জমা দিনে।—
মৃত্যুহীন
হয়ে থাক
সহস্র সম্বৎ
গড়েছি
যা কিছু আমি
নিজে এইখানে!

প্রথম সারিতে

আমার পেশল কাঁধে দিয়ে ভর
সময় দাঁড়িয়ে আছে সংগ্রামী সাজে।
শতবার আছে তাই অধিকার মোর
একথা বলতে আজ সকলের কাছে!

বাজ-ডাকা আকাশের নীচে লড়াইএর পথে
গানের আর গড়বার এই অধিকার
আমাকে দিয়েছে তারা নিজেদের হাতে
বেঁচেছিল যারা শুধু বিশটি বছর।

প্রিয় সখীদের স্মৃতির সম্মানে
কতবার হয়েছি নীরব অবনত শিরে!
অন্তরে জ্বলেছি আমরা ব্যথার আগুনে
কখনো কিন্তু তবু দাঁড়াইনি ফিরে!

পুনরায় ডাকে দিন সিংহনিনাদে
কেঁপে ওঠে থরো থরো আতঙ্কিত ধরা!
মাথার উপরে কালো মেঘ জমে ওঠে
বিদ্রোহী বাতাস ভাঙে আকাশের বেড়া…

সামনে দাঁড়িয়ে আছে কাজের পাহাড়।
দ্বিগুণ সংগ্রামী পথে আমাদের গান
দৃঢ় পদক্ষেপে, পতাকার সার,
যাত্রা করে বুলগেরিয়া মায়ের সন্তান।

আর বেশী দূর নয় পাহাড়ের চূড়া—
সেথা হতে কেউ ছোঁড়ে অসীম সাহস।
সোজা পথ বেয়ে শুধু উঠবো আমরা
বাঁচাবো বছর-দুই পৌঁছুতে সে দেশ।

দ্বিগুণ শক্তি চাই বাহুর পেশীতে,
সংগ্রামী শপথ চাই, তূর্যের নির্ঘোষ!
হে মোদের ভবিষ্যৎ, আজ এ সংঘাতে
আক্রমণ করো নিয়ে দুর্জয় রোষ।

আমাদের পেশল কাঁধ আজকে তোমার!
করো সাজ তুমি আজ সংগ্রামী সাজে।
আমাদেরো শতবার আছে অধিকার
এ কথা ঘোষণা করতে সকলের কাছে।

শতবার আমাদের আছে অধিকার
এ যুগসন্ধিক্ষণে জ্বালাময়ী হতে!
না হলে কি ভাবে এই সংগ্রামেতে
নেব স্থান প্রথম সারিতে।...

পরভান স্তেফানোভ ॥ ১৯৩১—॥

অঙ্গবাস

আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটলো বেশ তাড়াতাড়ি,
পুরোপুরি উপলব্ধি করবার আগেই।
কুয়োর স্থির জলে দেখে নিজের ছায়া
বুঝলো সে কিশোরী আর নেই।
রাতের স্বপ্নে দেখলো সে প্রজাপতি-আঁকা অঙ্গবাস…
ভোরের সে স্বপ্নটুকু কি ভালোই না ছিল।
কিন্তু বাবা উঠিয়ে দিলেন, তখনো কালো আকাশ,
ভেড়া চরাতে যেতে হবে, সময় নেই আর তিলও।

কিশোরীটির কপালে জোটেনি অঙ্গবাস,
বয়স বাড়লো, তবু তার বদলালো না পালা,
পাহাড়ী ঝর্ণার মতো কাঁদে যৌবনের আশ,
নিরাবরণ অঙ্গে অঙ্গে ভীষণ অগ্নিজ্বালা…

কয়েক বছর পরেই সে গেল পরের ঘর,
হেমন্তের ছায়া পড়লো চুলের গোছে তার,
তবু অপূর্ণ সাধ সেই কিশোরী-মনের
রয়ে গেল হৃদয় জুড়ে, চিরদিনের ভার।
কিন্তু আবার ততোদিনে সময় এসে গেছে
কিনতে হবে ছেলের জন্যে স্কুলের খাতা বই।
সন্তান তার শুধু কেবল থাকে যেন বেঁচে
অঙ্গবাস পরার সময় আসবে তাহ'লেই।

আঁচলের খুঁট কতোবার খুলেছে বেঁধেছে,
কয়েকটি রূপোর টাকার জমানো সম্পদ !
আর খরস্রোতা সময়ের দুরন্ত প্রবাহে
গভীর খাতের রেখা সারা মুখময়।
উত্তুরে পাখীরা কতোবার চলে.গেল উড়ে
চিমনীর মাথায় বাঁধা বাসা ভেঙ্গে দিয়ে।

শেষ অব্দি মানুষ হলো ছেলে !
কিছুদিন পরে
মার সখের জামা আনলো শহর থেকে কিনে।

অজানা আশঙ্কায় তার কেঁপে উঠল বুক,
জপলো মনে সহস্রবার ইষ্টদেবের নাম
প্রথম বার গেল সে আয়নার সমুখ
পূর্ণদেহ দেখলো নিজের মুঠোয় ধরে প্রাণ।
দেখলো কপাল, যেন কালি-মাখা,
কুঁচকে যাওয়া ত্বক, গভীর বলীরেখা।
গাঁয়ের পাশে কুয়োর নিথর জলে
এই কি মুখ যার সাথে হয়েছিল দেখা ?

গায়ের চামড়া পুড়ে হয়েছে ছাই…
সেই অঙ্গে অবশেষে উঠল অঙ্গবাস
আঁকা তাতে বিষাদভরা অপরাজিতার রাশ…
হে ভগবান! এতই কি দাম দিতে হবে পুরাতে একটি আশ

নিষ্ঠুর আঘাত হানলো প্রতিচ্ছবি,
ভেঙে চূরে ছড়িয়ে দিল কোথা,
পড়লো বুঝি কুয়োর গভীর জলে
ঝরে-পড়া গাছের একটি পাতা।

হারিয়ে যাওয়া দিনের কথা পড়লো মনে তার।
দুখের সাগর পাড়ি দিয়ে বুঝলো হৃদয় মাঝে
গোপন খুশীর এই ছোট্ট উপহার
অনেক, অনেক দেরী করে এসেছে তার কাছে।

অনুভব

এক ফালি মাঠ, আড়ালে মুখ লুকিয়ে,
শুয়ে আছে ঝিল আর টিলার মাঝখানে।
একমুঠো হরিৎ আলোক।

আমার শৈশব সেথায়, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে।
তার স্বপ্নের ছাগলছানাদের সাথে খেলায় মাতে।
চেয়ে দেখে ধীরে ধীরে পড়ে ভেঙে ঝরে পড়ে জলে।
কান পেতে শোনে বিচ্ছিন্ন তরুণ মূলের করুণ বিলাপ…

আর এই ক্ষীয়মান পাড় বহুকাল ধরে'
কোথায় যেন ঠাঁই নিয়েছে আমার গভীরে,
ঝিলের জল পায়ে পায়ে আসছে এগিয়ে।
তারপর একদিন ওঃ, জানি কি হবে!
সেই একমুঠো হরিৎ আলোক
সম্পূর্ণ গলে গিয়ে অস্তগামী হবে।
অনুভব করবো আমি এক সুতীব্র কম্পনে।
প্রাণবন্ত মূলগুলি ছিঁড়ে যাবে আমার অন্তরে।
আর সেই ছাগল-ছানারা প্রক্ষিপ্ত হবে অতল গহ্বরে…

তখন অজবৃদ্ধ একাকী যাত্রা করবে বন্ধুর পথে,
পাথরের কোণে খুঁজবে কাঁটা-গাছের ঝোপ।
অনুসরণ করবো তাকে আমি সর্বশক্তি দিয়ে।
উঁচুতে, যখন পা দুটি আমার হবে চলচ্ছক্তিহীন,
থামবো আমি, সূর্যাস্তের আলোয় স্নাত হতে।

আনাস্তাস স্তোয়ানোভ ॥ ১৯৩১— ॥

বুলগেরিয়া

ঘোড়ার পিঠে বসেই
দেখা যায় তাকে
কতোই বা পথ
হেঁটে পাড়ি দেওয়া যায় অনায়াসে ঃ

দুটো দিন
    দেভিন থেকে
        ভিদিন
আর ততোটুকুই হবে
    কোম থেকে
        এমিন।

বুলগেরিয়া—
মেলে ধরা একটি রুমাল,

রঙীন রুমাল
গোলাপ আর ঘামের গন্ধ তাতে মেশে।

সাগর তাকে ভেজায়
রিলার বাতাসে মাতাল

আর সে গা ভাসায়
সুনীল স্নিগ্ধ আকাশে।

শহরের ফুলতোলা
শিল্পের বিচিত্রা,

পতাকা, উত্তোলিত
বহু বহু বার,

শক্ত করে' বাঁধা
ভিদিন-সিলিস্ত্রা

আর দানিয়ূব নদী
নীল দণ্ড তার।

অল্পই নিয়েছে,
অনেক দিয়েছে,

ব্যর্থ করেছে
    সব লোলুপ প্রয়াসে।

এমনিই সে,
    সবটাই,
        পুরোটাই

এঁটে যায়
একটি
মানসে।

বোনটি

জিজ্ঞাসা ক'র না আমার বোন আছে কিনা,
কোথায় সে আজ আর কি রকম ছিল।
দূরের তারার মতো ছিল বোনটি আমার···
ছোট্ট তারাটি হায়, বড়ো ভুগছিল···

মৃত্যু শিয়রে, পরপারের পথিক তখন সে
—ভোরের আলো ফুটছে তখন সবে,—
মৃত্যু শিয়রে তার, বাবা আমায় বললেন দীর্ঘশ্বাসে,
শহর অনেক দূরে
আর পয়সা ছাড়া কি করে কি হবে।

একরত্তি মেয়ে—দোলনাটি ছিল অনেক বড়ো,
গাঁয়ের পাশের নদীও সে দেখেনি তখনো।
বলতে সে জানতো শুধু 'মা, মা,'
সবকিছুকেই ঐ নামেতে ডাকতো তখন ও।

সবাইকে ডাকতো সে ঐ একটি শব্দ দিয়ে
ঠাকুমাকে—আমায়—দুনিয়াতে যতোকিছু আছে,
নীল চোখের তারা দুটি মিলিয়ে যাবার আগে
ঐ নামেতে মরণকেও ডাকলো বুঝি কাছে।

ছোট্ট শীর্ণ হাতখানা তার দিল বাড়িয়ে
ঘামে-ভেজা মাথাভরা জট পাকানো চুল—
চললো যমের পিছু পিছু, ঠাকুমার আঁচল ধরে যেন
চললো ভোরে তুলতে বনের ফুল…
ছিল তার নীল নীল ছোটো দুটি চোখ।
আহা, চুলের বাহার কতো হতো তার
সতের বছর পরে আজ
যখন সে যেত বনে আনতে ফুলহার…

জিজ্ঞাসা ক'র না আমার বোন আছে কিনা।—
চোখের পাতায় জ্বালা এক বিন্দু জলে,
থাকতো আমার, আছে সবার যেমন,
কিন্তু শহর ছিল অনেক দূরের পথ
আর আমরা অসহায়—পয়সা ছিল না বলে।

একান্ত

বাবা আমার হলেন কমিউনিস্ট
ষোলো বছর বয়সে—
তুমি জানো সে-কথা।

বিয়ে করেছিলেন
সতেরো বছর বয়সে
ভালোবাসা জানে সে-কথা।

জন্মালো তার ছেলে
আঠারো বছর বয়সে—
আনন্দ জানে সে-কথা।

পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন বাবা
উনিশ বছব বয়সে—
বেদনা জানে সে-কথা।

তুমি আর আমি
মা গো,
জানি বাকিটুকু ঃ

একই পথে ফিরলাম দুজনে
মা গো,
ভেসে চোখের জলে।

দুজনে মিলে সারালাম ভাঙা চালা
মা গো,
ভেসে চোখের জলে।

যুবসংস্থায় নাম লেখালাম আমি
তেরো বছর বয়সে—
রাত্রি জানে সে-কথা।

প্রথম ট্রাক্টরের পেছনে গিয়েছি ছুটে
চৌদ্দ বছর বয়সে—
প্রান্তর জানে সে-কথা।

ব্রিগেডে স্বেচ্ছাসেবক হয়েছি
পনেরো বছর বয়সে—
হাতে-গড়া সড়ক জানে সে-কথা।

লিখেছি প্রথম কবিতা
ষোলো বছর বয়সে—
বাবার মৃত্যু-জয়ন্তীতে।

বাবার মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে।
তার পুরোনো ছবিটা ফেটে চৌচির, রং চটে গেছে।
আর তাই
সারা মুখ তার বলীরেখায় গেছে ভরে ;
আর তাই
মনে হয় সব চুল তার সাদা হয়ে গেছে।

বিশ্বাস করিনা আমি মৃতেরা চিরযুবা থাকে।
না।
ছেলে আমার বাবার ছবির দিকে
আঙুল দেখিয়ে বলে ঃ
—দাদু।

তোমার সাথীরা সব বুড়ো হয়ে গেছে, বাবা
বুড়ো হয়ে গেছে।
উঠোনের বুড়ো জাম গাছ ভেঙে পড়ে গেছে, বাবা।
ভেঙে পড়ে গেছে।
আমাদের পুরোনো বাড়ীটা কবে ধ্বসে গেছে, বাবা।
কবে ধ্বসে গেছে।

দেখছি ওপর থেকে
সবার বয়স উনিশ।

তখন দাঁড়াই এসে
উনিশ বছরের
বাবার সামনে।

শুধাই তাকে—
সময় হয়েছে কি ক্ষেতে হাল দেবার?

শুধাই তাকে—
পছন্দ হয়েছে কি আমাদের নতুন বাড়ীটা?

শুধাই তাকে—
ভালো লেগেছে কি আমার নূতন কবিতা!

চলি তার হাত ধরে
সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে
আস্তে—আস্তে!

বেঞ্চি দেখিয়ে দিই—
বসতে বলি,
বিশ্রাম নিতে।

পুরো ত্রিশ বছর ধরে অনেক যত্নে রেখেছি
উনিশ বছরের
আমার বাবাকে।

বিশ্বাস করি না আমি তাই,
মৃতেরা চিরযুবা থাকে।
না।
বিশ্বাস করি শুধু, তারা বেঁচে থাকে।
বিশ্বাস করি।

পেতর কারানগোভ ॥ ১৯৩১ —॥

পাখীর ডাক

সূত্রধরের চটুল ঘোষণা ঃ
—নকল পাখীর ডাক শুনুন এবার।

আমরা সবাই চুপ, হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
আবার ফিরে পেতে চাইলাম
বিস্মৃত পাখীর কণ্ঠস্বর।

হেমন্তের পাতাঝরা বনে ঘুঘুর ডাক,
বৃষ্টি-ভেজা বসন্তের কুঞ্জে কুঞ্জে
কোকিলের মধুকণ্ঠে সময় ঘোষণা,
আর নিঃসীম থে্সের আকাশের নীচে
কেঁপে ফেরা দোয়েলের গান
পথহারা শব্দের মতো
অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি জাগায় অন্তর গভীরে।

মাথার উপরে দুগ্ধফেন ছাদে
চিন্তায় দোদুল্যমান
রেস্তোরাঁর বিজলী বাতির গোল গোল চাঁদ।

মেলনিকের উপত্যকা থেকে জড়ো করা
ঘনোষ্ণ মৃত্তিকা-রস
ধমনীতে স্রোতস্বতী উজ্জ্বল ছটায়।
বেলোয়ারি গেলাসের রামধনু নির্ঝরে
বোতল-মুক্ত জলের বুদ্বুদ উচ্ছ্বাস।
আমরা কেমন যেন নীরব নিথর,
ডুবে যাই ফেলে-আসা জীবনের
শব্দের স্মৃতিতে।

ওগো মেয়েরা, নকল ফুলের সাজে
কখনো সেজো-না।

বন্ধুরা
প্লাষ্টিকের জৌলুষের নকল ক'র না,
তুমি যা, তারই কাছাকাছি থাকো।
পালিয়োনা নিজের সান্নিধ্য থেকে,
আবদ্ধ ক'র না নিজেকে
শহরের নির্দয় মেকী চৌদেয়ালে।
জনাকীর্ণ এ শহরের সব পথ
লোকারণ্য হবে অচিরেই।

অবশেষে বাইরে বেরোলাম।
চললাম আমরা শত শত পথে
কোনো বিশাল অট্টালিকার ছাদের আংটায়
ঝুলে-থাকা ছোট ছোট খাঁচার উদ্দেশে।
বুলগেরিয়ার তারার কাছাকাছি,
তবু তাদের থেকে কতো কতো দূরে!

পথ চলি ধীরে। প্রথম বার আস্তে পা চালাই
রাত্রির ঘেরাটোপ পরা পথে বাড়ীর পানে।

সেখানে—সদর দরজার সামনে,
ঢোকবার আগে,
থেমে গিয়ে, দু-হাত বাড়িয়ে
চেষ্টা করি শহুরে আঙ্গুল দিয়ে
দুমুঠো আকাশকে পেতে।
কিন্তু একবার পরিত্যক্ত আকাশ
থেকে যায় তেমনি দুর্লভ।
আমাদের হৃদয়ে তখন গভীর শূন্যতা, যেন
বৃষ্টির জলে-ধোয়া পাখীর কঙ্কাল।

আমাদের পিছনে, অন্ধকারে
শোনা যায় কোকিলের ব্যঙ্গভরা ডাক।

ছুটি

আগস্টের ঘাস-নিড়ানো মাঠে—
টস্‌টসে নাসপাতি, টক টক বৈঁচির ছড়া।
ছুটির জগৎ।
পাহাড়েব উঁচু-নীচু ঢিবি, দূরে বনরেখা।
আর নির্জীব প্রান্তর…

জীবনের স্বীকৃতি খুঁজি
নিজেদের পদশব্দে।
তবুও আমরা বয়ে বেড়াই
সাথে করে ক্ষতের বেদনা
এই জনহীন রাজপথে,
সঙ্গী তারা আমাদের
টেলিফোনের তারের নীচে, যেখানে বসেছে মুনিয়ার মেলা।
আর খুশী হই পাখীদের দেখে, যাদের এখনো মেরে ফেলিনি।

তোমার কি মনে পড়ে
ছেলেবেলার একটি ছুটির কথা?
ক্ষতগুলি আমাদের হয়েছে গভীর—
নিরাময় হবে সে ক্ষত হেমন্তের রোদ্দুরে,

মাড়াই-কলের কাছে কাছে খুঁজব গমের কণা।
খুঁজে-পেতে বার করব উষ্ণ পাথরের চাঁই,
বসবো তার উপরে।

রেলগাড়ী যাওয়া-আসা করে নীচের উপত্যকায়,
হৈমন্তিক খুশীতে উপছে-পড়া যাত্রীতে ঠাসা।
হায়, এত তাড়াতাড়ি কেন ফিকে হয়ে গেল
আমাদের বিচিত্রবর্ণ ছেলেবেলার ছুটির দিনগুলি ?

তোমার মতোই দুর্বল আমি—শক্তি নেই
তোমাকে উদ্ধার করি ব্যথার সাগর থেকে।
সাদামাটা শব্দ কতগুলি আমার সম্বল—
সাধারণ শব্দ তারা—মাটি, আগুন,
রুটি, কাঠ আর সুরা।
এ ভাবেই বেঁচে-থাকা প্রচেষ্টা আমার।
কোনো প্রশ্নের উত্তর দিই না আমি এ সব শব্দ দিয়ে,
অন্ততঃ সে প্রশ্নের তো নয়ই
যে প্রশ্ন আজ বেড়ে উঠেছে
গাছের মতো আমাদের মাথার উপরে…

নদীতীরের বাদাম গাছের পিছে সূর্য অস্ত গেল।
লোহার নাল লাগানো আমাদের জুতোয়
শুকোয় হাঁসের রক্ত।

কাব্য

ডোরা বোনেভা-কে

আমাদের ছোট্ট শহরটিতে, যেখানে
সবার আছে অঢেল সময় ভাববার,
আশেপাশে তাকিয়ে দেখবার আর মনে রাখবার
অকিঞ্চিৎকর অনেক ঘটনা,
দেখা দিল একজন লোক—অদ্ভুত মানুষ,
মাথায় চওড়া টুপি আর চলে দীর্ঘ পদক্ষেপে।
দিন কয়েক পরেই
এ ঘটনাটি জেনে গেল
প্রত্যেকটি লোক
আমাদের ছোট্ট শহরটির, যেখানে
সবার আছে অঢেল সময় ভাববার,
আশে-পাশে তাকিয়ে দেখবার আর মনে রাখবার
অকিঞ্চিৎকর অনেক ঘটনা।

প্রতিদিন ভোরে সে মানুষটি,
মাথায় চওড়া টুপি যে চলতো দীর্ঘ পদক্ষেপে,
শহরটাকে পরিক্রমা করতো
একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত।
খালি-পা একপাল ছেলে
সর্বক্ষণ ঘুরতো তার আশেপাশে।
তারা উপহার দিত তাকে জংলী নাসপাতি,
পাখীর ছানা আর ছাই-রং ছোট খরগোশ,
পুরোনো মৃৎপাত্রের টুকরো আর প্রাচীন মুদ্রা

তারই ফাঁকে ফাঁকে তৈরি হতো অপূর্ব জিনিষ···
আসলে অদ্ভুত কিছু নয়—
ছবি আঁকতো লোকটি।

একদিন
আমাদের শহরের সবাই
যাদের আছে অঢেল সময় ভাববার,
আশেপাশে তাকিয়ে দেখবার আর মনে রাখবার
অকিঞ্চিৎকর অনেক ঘটনা,
হাজির হলো
যেখানে সে আঁকছিল ছবি।
তারা চেয়ে দেখলো চাঁদ—সেই চাঁদ
এতকাল ধরে যাকে দেখেছে তারা
প্রাচীন গীর্জার মাথায়।
পটের উপরে নেমেছে সে আজ,
রুটির মতো গড়াগড়ি দিয়ে
সবুজ আকাশের বুকে।

সেই রাতে
আমাদের ছোট্ট শহরটিতে
প্রত্যেকটি মানুষ,
বিছানায় শুয়ে
ভেবেছিল সে চাঁদের কথা।
আর ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখেছিল
সেই একই চাঁদ,
সেই একই প্রাচীন গীর্জার মাথায়
যেখানে এতকাল ধরে ···
যে চাঁদ
এর আগে কোনোদিন
স্বপ্নে দেখেনি তারা।

বড়ো অদ্ভুত মানুষ ছিল সে—
চওড়া টুপি মাথায় আর চলে দীর্ঘ পদক্ষেপে—
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোড়-খাওয়া এ শহরের লোকেদের
শেখালো সে স্বপ্ন দেখতে
এমন সব সাধারণ জিনিষের।

স্লাভ খ্‌স্তো কারাস্লাভোভ ॥ ১৯৩২— ॥

কালো মাটি

যেখানে ছিল
অরণ্য
গজিয়েছে গম,
যেখানে ছিল
পাখীর বাসা—
পাখীরা উড়ে চলে গেছে,
যারা ছিল
শিশু—
যৌবনে পদার্পণ করেছে…

এক ভোর থেকে
অন্য ভোরে
বদলে যাচ্ছে পৃথিবী।

যেখানে ছিল
গ্রাম—
শহরের পত্তন হয়েছে,
যেখানে বইতো
নদী—
হ্রদের জন্ম হয়েছে,
যেখানে চলতো
গরুর গাড়ী—
ট্রাকটর মাড়িয়ে যায় গাড়োয়ানের ছড়ি…

এক ভোর থেকে
অন্য ভোরে
বদলে যাচ্ছে পৃথিবী।

একমাত্র কালো মাটি
রং বদলায়নি তার।
সে আছে
তেমনি পরিবর্তনহীন,
রুদ্রমূর্তি মেঘের মতো,
বিদায়ী কফিন-ঢাকা
কালো চাদরের মতো।

লুকিয়ে রেখেছে
তার হৃদয়-গভীরে
অনেক অতীত-ব্যথা।

তৃতীয় কথোপকথন

হাঁটতে শিখেছো তুমি
মহাকাশ-যানের সাথে,
তোমার কাছে আজ একাধিক পথের সুযোগ।
নির্মেঘ নির্মল দিনে
গোলাপী সূর্যাস্তের আভায়
জ্বলবে তুমি উদ্দীপনায়
আর প্রতিবাদে।

যখন চোখ বোলাবে বইয়েয় পাতায়,
অনুকম্পা জাগবে তখন মনে
        আমার কথা ভেবে :
—আশ্চর্য লোক ছিল বুড়ো,
        যন্ত্রপাতি দেখে
        খুশী হয়নি কোনোদিন,
যেমনটি খুশী হ'তো কালো কালো মোষদের
        গায়ে কাদা মেখে…

আর তোমার মাথার উপরে
অ্যান্টেনার অরণ্য।
টেলিভিশনের চোখের
ইশারায়
পৌঁছুবে তুমি দূরের নক্ষত্রে,
নিরুত্তাপ,
অমিতশক্তির আধার,
অনেক উঁচুতে।

দূরত্ব, সময়,
    আর পথ
পরিমাপ করবে তুমি
        মিনিটে
            আর মুহূর্তে।

এখানে,
থে সের বর্ণালী কোণে কোণে
মরচে পড়বে সৈনিকের কৃপাণে,
আমাদের পিতামহদের গোলাঘরের পাশে
পচন ধরবে কাঠের লাঙ্গলে।
একটা কুঁজো-পিঠ কূয়োর কপিকল শুধু
অতীত দিনের কথা তোমায় স্মরণ করাবে।

শোনো,
বীতশ্রদ্ধ নই আমি যন্ত্রের প্রতি,
কিন্তু আমি যে পথ চলেছি
            হাতে নিয়ে
            গাছের ডালের ছড়ি।
টেলিভিশন ছিল আমার
            ক্ষেতের মাঝে
            স্নেহার্দ্র
            মোষের একটি চোখ।

সব থেকে সেরা মানুষ

মাঠ থেকে ফিরতো সে সন্ধ্যায়
এক হাঁটু ধুলো-কাদা মাখা,
রোদে পোড়া দেহ তার, চট্‌চটে মাথা
মুখখানি খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা।

বৌ তার পেতে দিত ফুলতোলা কাঁথা,
ঢেলে দিত সান্‌কিতে শিমের সুরুয়া
দেখতো তাকিয়ে তাকে, নিয়ে এক-বুক ব্যথা
শ্মশানের মতো চুপ, মুখে নেই রা'।

ভোর হ'তে কোনো মতে দুটি মুখে গুঁজে
সারা দিন কাটিয়েছে লাঙ্গলের পিছে,
ঝরে পড়ে খাটে-পাতা মাদুরের 'পরে,
সব শক্তিটুকু বুঝি তার নিংড়ে নিয়েছে।

মেজাজ খারাপ যদি থাকে কোনোদিন
হাত-পা চালাতে সে করে না কসুর,
দু-চারটে কিল-চড় বৌয়ের কপালে,
শুয়ে পড়ে অন্যপাশে ফিরে তারপর।

বিনিদ্র চোখে বৌ শুয়ে থাকে রাতে
ঘুমন্ত স্বামীর পাশে, চোখে তার তখনো ভ্রূকুটি,
ভেঙ্গে সে পড়েনি তবু কখনো কান্নাতে,
অভিযোগহীন থাকে তার প্রশান্ত মুখটি।

ঘোড়ার চাটে জখম হ'লো গম-মাড়াই কলে
পুরোটা হেমন্ত জুড়ে পড়ে রইলো অসাড়,
উঠলো না খাট থেকে শীত গেল চলে,
বৌকে সে বললো একদিন ঃ
—বেশী দিন বাঁচবো না আর।

মাফ কোরো, দুর্ব্যবহার করেছি অনেক
মেরে পিটে বহুবার ছুটিয়েছি খুন।
ততোটা খারাপ নয় মনটা আমার
যতোটা অসহ ছিল এ দুর্বহ জীবন।

দীর্ঘ—দীর্ঘকাল ধরে চেয়ে থাকে তার মুখপানে
দৃষ্টি তার হয়নি কখনো এমন বাঙ্ময়।
নীরবে চুম্বন করে বৌ তার হাতখানা টেনে,
স্ত্রীর দুটি হাত সেও চুমাতে ভরায়।

সেই হাত, যে হাত আঘাতে হয়েছে নির্দয়,
সেই ভারী ভারী হাত দু'টো দিয়ে তাকে
জীবনে প্রথমবার সে সোহাগ জানায়
হৃদয় উজাড় করে, অশ্রুভরা ছলছল চোখে।

বুক-ফাটা কান্নায় বৌ ভেঙে পড়ে,
রেশ তার ভেসে যায় দূর থেকে দূরে।
মানুষটি আজ চলে গেছে পরপারে,
যার স্থান দিয়েছে সে সবার উপরে।

রুদ্র সূর্য

শিরার মতো ফাটে নদীর বুক,
দেখার আগেই উপত্যকার বুক—
ফুটিফাটা মাটির মাথায় সেতুগুলো ঝোলে।
গমের চারা—বিঘৎখানেক, উষ্ণ হাওয়ায় দোলে।
অরণ্য বাড়িয়ে দেয় সবুজ পাতার হাত।
যেন সেরে-ওঠা কুষ্ঠরোগীর ঘাত
দেখা দেয় শুকিয়ে-আসা ডোবার কালো মাটি···
দুর্বার আকাঙ্খা
তাদের
হতে পরিপাটি।
ছায়ায় বসে ফিসফিসিয়ে পরামর্শ চলে।
কর্মহীন প্রৌঢ়ের দল হাতে বোঝাই থলে
এদিকে ওদিকে যায়! বাজার-দরের করে মুণ্ডপাত ঃ
চাল! ডাল! আটা! ···এদিকে খালি-হাত!
গুবরে পোকার মৃত স্তূপ জমে গোলা-ঘরে
যেথায় গমের বুক তারা খায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে,
বন্দী হৃদয়ে জাগায় বিস্ফোরণ প্রবল,
অস্পৃষ্ট থাকে কেবল নির্দোষ
শিশুদল।
রুদ্রতেজ গ্রীষ্মে সাদা রং পাখী,
আর ফুলবাগিচার বর্ণালী রাখী।

সেতু

আমি তোমাদের পায়ের তলার সেতু।
আমি হলাম সেতু।
আমি সেই পুরোনো পাথরে বাঁধাই সেতু।

আমার ধূসর ধনুর্দেহে সুডৌল উচ্ছ্বাস।
আমার বুকে জমা হয়েছে ঢের
চিহ্ন পায়ের, চাকার আর অশ্বক্ষুরের…
আমি নিজে এক জীবন্ত পূর্ণ ইতিহাস।
সকলে আসে, পার হয়ে চলে যায় সবাই
ফেলে রেখে যায় শুধু পদচিহ্নের ছাই।
সবাই তোমরা অতিথি আমার।
কাজ আমার অতিথি-সৎকার।
আমি হলাম সেতু।

আমি সেতু, তোমাদের তরে আমার সেতুবন্ধন,
আমি সেতু, তোমাদের পায়ের তলায় আমি সঙ্গীহীন।
সঙ্গী আমার নদীর জলে খেয়ালী প্রতিচ্ছবি,
আমি পাথরে-গড়া, সে রেশম-কোমল দেবী।
তবু আমরা দুজনে মিলে থাকি কোনো অন্য-ভূলোকে
অনন্ত কাল ধরে দেখি আমি তাকে ব্যথাভরা চোখে
অপরূপ রূপের লীলাখেলা তার, আমি ধুঁকতে ধুঁকতে
বয়ে চলি বোঝা মানুষ আর দিনের…
আমি হলাম সেতু।

আমি হলাম সেতু, সে হলো অলীক।
আমি সত্যিকারের, তার নেই অস্তিত্বের ঠিক।
সুন্দরী সে, কিন্তু আমার ধূসর প্রাচীন
রামধনু দেহ অবক্ষয়ে ক্ষীণ
আর কোনো এক ভয়ঙ্কর দিন পড়বে ভেঙে।
মৃত্যুর মুহূর্তে আমি মিলবো অবশেষে
আমার জরাগ্রস্ত দেহের
অশরীরী প্রতিচ্ছবির সাথে,
আমি হলাম সেতু।

…আর এখন—আমি হলাম প্রজাপতির নির্বন্ধ
গাঁঠছড়ায় বেঁধেছি নদীর দুই উচ্ছল তীর,
তোমরা যখন থাকো আমার উপরে—এক তীর
ফেলে-আসা স্বপ্নের অতীত,
তোমাদের কাছে সে ইতিহাস।
অন্য তীর এখনো ভবিষ্যত!
নীরব থাকি আমি, পায়ে পায়ে পার হয়ে যাও
আমার শক্তিশালী রামধনু দেহ।

আমি হলাম সেতু।

ল্যুবোমির লেভচেভ ॥ ১৯৩৫— ॥

নক্ষত্রেরা আমার

—হ্যাঁ, তারা আমার!...
মোটেই তামাসা নয়।
হে'স না অমন ভাবে—
বিশ্বাস হয় না বুঝি?...

—ছোক্‌রা,
নক্ষত্রেরা অনেক দূরের বাসিন্দা!...
চাও যদি, তাদের ছবি আঁকতে পারো,—
মনকে চোখ ঠারতে করে থাকে অনেকেই,
কিন্তু নক্ষত্রেরা—
অগম্য তারা!...
তাই না তারা এত অপূর্ব সুন্দর...

—হায়, কেমন করে বোঝাবো তোমাদের, তারা আমার।
যদি তোমাদের কান থাকতো,
শুনতে পেতে আমার সাথে কথাবার্তা তাদের সবাকার:
জীবন্ত,
এবং মৃত,
এমনকি প্রস্তরীভূত!...
নক্ষত্রেরও আছে নিজেদের ভাষা,
বলে আমায় তারা:
"আমরা তোমার!"

—কল্পনাবিলাসী,
বৃথা এ বিতর্ক।
অভিরুচি যেমন তোমার, হও তুমি নক্ষত্রের সর্দার!···

···আমায় বিশ্বাস করেনি কেউ!···
নক্ষত্রেরা অনেক দূরের বাসিন্দা,
আর আমরা এখনো স্থাণু পৃথিবীর বুকে।

পৃথিবী,
পৃথিবী,
তোমার থেকে অনেক গুরু-ভার
অবিশ্বাস!···
পৃথিবী,
পৃথিবী,
তোমাকেও তো বেঁধে দিতে চেয়েছিল
আদ্যিকালের সেই কচ্ছপের পিঠে।

বিস্মিত হয়ো না কেউ হৃদয়ের ডালা!

না থাকতো যদি উদ্ভট কল্পনাবিলাসী
সেই সব মানুষের অবিশ্বাস্য আশা,
অস্তিত্বহীন হতো যদি কল্পনার দেশ,
পাগলামী না থাকতো যদি,
কি করে আজ উড়তো আকাশে
রক্তপতাকা
কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা?

আমারো জন্ম হয়েছে সংগ্রামী সময়ে।
আমারো শৈশব কেটেছে সেই দোলনায়
সংগ্রামী রক্তপতাকায়
অঙ্গসজ্জা যার,
তাই জ্বলে বহ্নিশিখা চোখেতে আমার!
শ্রেণীযুদ্ধে আমিও সামিল,
দুঃসাহসী হোক আমার কল্পনা,
স্পার্টাকাসের স্বপ্নের থেকে
আরো দুঃসাহসী।

হৃদয়,
হৃদয় আমার,
বিমর্ষ হয়ো না তুমি
অবিশ্বাসীর ব্যঙ্গের হাসিতে।
জানি,
ধিকিধিকি জ্বলবে তোমার বিশ্বাস,
ক্লান্ত যবে হবে এ পৃথিবী
সূর্যের চারিদিকে নিরন্তর আবর্তনে।...

১৯৫৭

মহৎ ব্যক্তি

ব্লাস্ট ফারনেসের
সর্বোচ্চ সিঁড়ি থেকে
তোমাদের সে দেখছে এখন
শান্ত,
    তীক্ষ্ণ,
        বুলগেরীয় চোখে।

হাড়ভাঙ্গা খাটুনির শেষে
বিশ্রাম করছে সে
উত্তপ্ত লোহার পরে আধশোয়া হয়ে।
পাত্‌লুনে মোছে যে হাত।
সিগারেট ধরিয়ে নেয় সূর্যাস্তের আগুনে।
তোমরা দেখতে পাও লাল বিন্দু মাথার ওপরে।
ভুলেও ভেবোনা
এ হলো বিমানপোতের জন্য
সাংকেতিক আলো।
উঁচুতে জ্বলছে তার সিগারেট।
অদৃশ্য বুলগেরীয় চোখ
দেখছে তোমাদের,
ধৈর্যস্থির
আর দয়াহীন চোখে
তোমাদের খেলা নীচের মাটিতে, ঘর-ঘর, বাড়ী-বাড়ী।
নাটুকে ভঙ্গিমা,
মোটর গাড়ী,
কথা,
    কথা,
        কথা

(হায়, ডেনমার্কের রাজকুমার)…
আর একটানা
আইনরক্ষক ও আপাশে…

সত্যিই কি তোমরা স্থিরনিশ্চিত,
সে শুধু জুড়ছে নানান লোহার টুকরো,
স্ক্রু অাঁটছে এখানে ওখানে
ইত্যাদি ?

যদি সে হঠাৎ বলে ওঠে,
মোটেই সে গড়ছে না ব্লাস্ট ফারনেস,
দাহন-চুল্লী তৈরী করছে সে
তোমাদের মধুর বিভ্রান্তির,
তোমরা কি চেঁচিয়ে উঠবে ঃ
—কে তুমি ?
কে তোমাকে অধিকার দিয়েছে ?…

অর্থহীন।

সর্বোচ্চ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
তাকিয়ে দেখবে সে,
মহৎ
এবং পরিচয়হীন।

…তার নিরাপত্তার খাতিরে
ভবিষ্যত লুকিয়ে রেখেছে তার নাম।

১৯৬৭

এখানে থামা নিষেধ

থামলাম।
ঠিক সেই সাইনবোর্ডের তলায়,
লেখা তাতে ঃ
"এখানে থামা নিষেধ!"
তখন তুমি আমায় বললে
—এই হ'ল আমার প্রিয় জায়গা…

ব্রিজ।
লোহা আর তক্তায় তৈরী।
হায়, মরচে-ধরা রামধনু!
আর সাইনবোর্ডে লেখা ঃ
"এখানে থামা নিষেধ!"

ব্রিজের নীচে বইছে না নদী।
রেলের লাইন দিগন্তে দিয়েছে পাড়ি।
সিগন্যালের
ডানার হাতছানি।
আর মধ্যরাতের শান্টিংএর বিকট রৌরব।

যখন
আমাদের পায়ের তলা দিয়ে
ইঞ্জিন যাওয়া-আসা করে,
ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে দেয় আমাদের।
তখন, সব চক্ষুর অন্তরালে,
একান্ত একাকী,
তোমার ঠোঁটের স্পর্শ আমার অধরে।

নিশ্চিত আমি, লক্ষ লক্ষ ওয়াগন
আমাদের চুমোতে বোঝাই হয়ে
চলে যায় পৃথিবীর
প্রতি কোণে কোণে।
চললাম আমরা
যখন বললাম তোমায় ঃ
—এই হ'ল আমার প্রিয় জায়গা…

ব্রিজ।
অপরূপ।
এবং অবিস্মরণীয়।
কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিস্থল।
আর সাইনবোর্ডের বিজ্ঞপ্তি ঃ
"এখানে থামা নিষেধ!"

১৯৬১

কবিতা

১

হে প্রিয় বন্ধুগণ,
তোমাদের কাছে পৌঁছুতে
পার হয়ে আসি আমি বিরাট দূরত্ব।

২

নাম রেখেছে
যারা
পাহাড় আর নদীর,
অতল খাদের আর খুঁটিনাটি সব জিনিষের,
ভেবে উঠতে পারেনি তারা
আমার পথের নাম।

৩

তাইতো মুস্কিল এত সবকিছু তোমাদের গুছিয়ে বলতে
(কথা বড়ো অমসৃণ
মোড়কের কাগজ
তার, যা আমি রাখতে চাই সঙ্গোপনে
তোমাদের কাছে।)

৪

তাইতো চুপ করে থাকি কখনো কখনো।

৫

রক্ত আমার শূন্য গ্রুপের
সবাইকে দিতে পারি,
কিন্তু নিতে পারিনা সকলের থেকে।

৬

তাই চুপ করে থাকি।

৭

আনন্দ জোয়ারে ভাসি
শব্দহীন
উচ্ছল হাসিতে।

৮

আর তোমাদের সাথে একসাথে প্রশান্ত নীলিমায়…

১৯৬৬

কবিতা পাঠ

কবিতা পাঠ,
কবিতা পাঠ।…
ছাত্র সংসদের চৌহদ্দি থেকে
        হলঘরের জয়জয়কার পর্যন্ত,
বায়ুচালিত যাঁতাকল
আর অশরীরী ছায়ার বিরুদ্ধে,
দারুণ কাজের দিনে
তাও আবার লৌহবর্ম ছাড়া…
কবি তার কবিতার পিছনে ছোটে সমস্ত জীবন,
সাঙ্কোর মতো ডন কুইক্‌সোটের অনুগমন!

তা, অবশ্যই,
প্রত্যেকেই পেলো ফুলের স্তবক।

কিন্তু এ ছাড়াও আছে সুদূরের ছোট ছোট শহরের মেলা।
রেলের স্টেশন।
নেড়ী কুকুরের ঘেউ ঘেউ।
স্তূপীকৃত চিনি-বিট আর শূন্য ঝুড়ির পাহাড়…
আর এইতো—
আমরা
ধীরে ধীরে ঝরে পড়ি
সান্ধ্য ট্রেন থেকে।

ইস্টিশনের ঘণ্টার কাছে অপেক্ষায় আছে
বিহ্বল এক ছোকরা,—
সেই চিরন্তন
        অপরিচিত
                আমাদের সৎভাই,

ডেকে যে এনেছি আমাদের অপার্থিব আত্মার মতো নিজের জগতে
সেই "সমস্ত উৎসাহী নির্মাণ-শ্রমিকদের পক্ষ থেকে",
যারা এই সাথে "কবিতাপাঠ শুনতে দারুণ আগ্রহী।"

বেশ!
চললাম আমরা সামরিক নিস্তব্ধতায়।
সোজাপথ ঠেকে যেন চষা-ক্ষেত।
কিন্তু আমাদের সামনে
নেশাখোরের মতো
উত্তেজনায় জ্বলছে
নির্মাণক্ষেত্রের ইলেকট্রিকের ফুল।
২নং ক্যান্টিনে
খাবারের ভুরভুরে গন্ধের মাঝে
তোমার উদ্দেশে,
হে বিংশ শতাব্দী,
আমাদের নিবেদন ঃ

"স্বপ্নে
আর প্রতারণায়
রক্তাক্ত তোমার সর্বাঙ্গ!
প্রয়োজন তোমার আজ
ক্ষ্যাপা কবির আওয়াজ!
মাইনহীন করবো আমরা তোমার আকাশ!..."
আরো কতো উদ্দীপনাময় অলৌকিক অঙ্গীকার!
কিন্তু সেই একমুঠো ফিটার শ্রমিক,
যারা শুনতে এসেছিল আমাদের কবিতা
উদ্দীপ্ত হলো না কেউ—
সিগারেটে দম নিতে বাইরে বেরোয়।
তাদের নীল চোখের তারায় হতবুদ্ধির সুস্পষ্ট ছাপ ঃ
—শহুরে শিল্পীরা বকছে কেন এত?...

কবিরা সব কিছু সহ্য করতে পারে--
ক্ষুধায় পেট জ্বললেও
গান গাইতে পারে,
সইতে পারে বেকারীর জ্বালা,
কলেজ-তাড়ানো ছাত্র হতে পারে···

কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গন,
          চলবে কি হাততালি না পেলে!
          হাসো এক গাল!
বলো, কিছুই এসে যায় না তাতে।
কিন্তু অন্তরে তোমার ধ্বনিত হবে বার বার—
                    পরাজয়!
                    পরাজয়!

আর তাই
কতোবার
ট্রেনের খাবার-কামরায়
ধুয়ে ফেলি ক্ষতস্থানগুলি মদের আরকে।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেউ
বলে ওঠে বিষণ্ণ বিদ্রূপে ঃ
—আর ঝেনিয়া এভতুশেঙ্কো কবিতা পড়ে স্টেডিয়ামে!
একেই বলে,
          ব্রাদার,
               রাশিয়ান ভাষা—
কেউকেটা না হলেও শুনবে তোমাকে···
—এমন কি বিন্দুবিসর্গ না বুঝলেও
কেউ না কেউ নিউইয়র্কে
          তোমাকে বাহবা দেবে···

—আরে না !
কবিতার জায়গা নয় স্টেডিয়াম !
কবিতা পড়তে হয় পবিত্র মুহূর্তে ।
প্রেম পত্রের মতো ।
বেআইনী ইশ্‌তাহারের মতো ।
লোক-দেখানোর থেকে যাদের কাছে
উৎসর্জন অনেক বড়ো !···
কিন্তু ফিরতি ট্রেন থামলো অবশেষে ।
ছড়িয়ে গেল কবির দল
তাদের পুরোনো আস্তানার পানে,
জায়গা নিতে নতুন লড়াইয়ের ময়দানে···
পার্ক, আর
স্টেডিয়াম ঘুরে
আমিও বাড়ির পথে অনেক রাতে...

যখন হঠাৎ খেয়াল হলো
স্টেডিয়ামের দেয়ালখানা ভাঙ্গা ।
আমার মুখে খেলে গেল এক চিলতে হাসি ।
স্মৃতির মতো ঢুকে পড়লাম
জনশূন্য মাঠে
বিশাল এক গহ্বরের মাঝে ।
ফেলে যাওয়া বোতল
সিঁড়িতে গড়িয়ে গিয়ে, তোলে
অলৌকিক ধ্বনির ঝংকার
অবাস্তব অ্যাম্ফিথিয়েটারে ।
আর তখন...
তখন যেন পেয়ে বসলো আমায়
অদ্ভুত এক রোমান্টিক কল্পনা ।

তিন কোটি নক্ষত্র ব'সে স্টেডিয়ামের সিঁড়িতে সিঁড়িতে
একদৃষ্টে দেখছে আমাকে।
আবৃত্তি সুরু করলাম আমি
উদাত্ত কণ্ঠস্বরে।
আমার অনাবিল অকৃত্রিম আবেগ
অনুরণিত হলো অন্ধকারে।
নক্ষত্রের মেলাকে বলেছি হয়তো
কি করে ঘটে মানুষের অভ্যুদয়।
কতো কঠিন তার পক্ষে আলো দেওয়া সমস্ত জীবন।
তা-ও আবার নিজের আলোকে।
জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যেতে
নতুন কল্পনা
অথবা নির্মল কবিতার ছত্রের জন্য…

থেকে থাকে যদি কোনো চৌকিদার
নিশ্চয় ভেবেছে সে, আমার মাথার গোলমাল।
কিন্তু তার জন্যে,
বুঝলেন,
এতটুকু ভাবি না আমি।
বড়ো খাঁটি ছিল আমার সে কবিতাপাঠ,
আর তাই আমার আপত্তি নেই আপনাদের ঈর্ষায়!

১৯৬৭.

দামিয়ান দামিয়ানোভ ॥ ১৯৩৫— ॥

না, মরবো না

না, মরবো না ! উপলব্ধি করছি এখন ।
একান্তে বলে আমাকে এই পর্বতশ্রেণী,
যারা আমাকে একাত্ম করেছে নিখিলের সাথে,
তার মাঝে আমার কণ্ঠস্বর বাজে
জাগরিত পাহাড়িয়া প্রতিধ্বনির মতো ।
না, মরবো না ! সুপ্রাচীন বলকান পাহাড়
প্রকম্পিত আমার সম্মুখে—সবুজ আমার পোশাক ।
না, মরবো না ! প্রজ্জ্বলিত দিন
মশালের মতো জ্বলছে আমার চারিপাশে ।
সমস্ত গিরিশ্রেণী জড়ো করেছি আমার চোখের তারায় ।
পাহাড়ে, বাতাসে, লতাপাতা গাছে
চিরতরে থাকবো আমি অনুকণা হয়ে ।
থাকবো আমি রাখালের বাঁশীর সুরে সুরে,
ঘাসে আর এই শালিখ পাখীর ঝাঁকে ।
এ সবকিছুর মৃত্যু হতে পারে না,
বেঁচে থাকবে তারা আমার মৃত্যুর পরেও ।

গ্রীষ্ম

গুমোট রাত। কেউ নেই আমার আশেপাশে।
অদূরে খোলা রেস্তোরাঁ থেকে
ভেসে আসে সুরার তীব্র গন্ধ
আর ইভ মোন্‌তানের[১] পুরোনো গানের কলি।
দেওয়াল ঘেঁষে ঘন অন্ধকারে দেখা যায়
সাদা জামা পরা একটি হাত
বার বার ঝাড়ে সিগারেটের ছাই।
পুরো এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক একই ভাবে,
কিন্তু যার জন্যে অধীর অপেক্ষা, এখনো দেখা নেই তার·
সাদা হাতটি অদৃশ্য হয়ে যায়···
গান আর প্রবঞ্চনায় ভরা এ রাত।
কিন্তু সুদূর ভিয়েৎনামে কোথাও
এই মুহূর্তে কয়েকজন সৈনিক নিশ্চিত লুটিয়ে পড়ল।
প্রতারিত প্রেম···যুদ্ধ···প্রশান্তি।
তার সাথে, ইভ মোন্‌তান, আর মাস্তিকার[২] গন্ধ।
কতো বিষণ্ণ এ গ্রীষ্ম, হায় ভগবান!

১। ইভ মোন্‌তান—প্রসিদ্ধ ফরাসী গাইয়ে।
২। মাস্তিকা—বুলগেরিয়ার নিজস্ব তীব্র সুরাসার জাতীয় পানীয়।

নাটক

একদিন, নাটকের ঠিক মাঝামাঝি,
অকস্মাৎ তুমি নেমে আসবে মঞ্চ থেকে,
বাঁ-দিকের তৃতীয় সারিতে খুঁজে বার করবে আমায়
তারপর সবার চোখের সামনে আমায় চুমু খাবে।
দর্শকরা ধরে নেবে এটাও নাটকের অংশ,
আনন্দে হাততালি দেবে তারা।

আসলে
তুমি পালাচ্ছো নাট্যকারের কাছ থেকে,
পালাচ্ছো পাদপ্রদীপ থেকে দূরে,
পালাচ্ছো তুমি অভিনয়ের ভূমিকা থেকে,
পালাচ্ছো তুমি সাজ পোশাক ছেড়ে,
পালাচ্ছো তুনি নিজের কাছ থেকে, নিজের সত্তা থেকে।

আমি তোমায় বার করে এনে ট্যাক্সিতে চাপি।
আর তুমি আমার বাহুতে এলিয়ে দাও
পাগল-করা তোমার এক খোঁপা বাদামী চুল।

মানস-চোখে দেখেছি আমি প্রেক্ষাগৃহের বিভ্রান্তি।
ত্বরিত গতিতে বাইরে বেরিয়ে গাড়ীতে চাপে দর্শকের দল,
ধাওয়া করে আমাদের গাড়ী, যে গাড়ীতে ছুটে চলেছে
তাদের প্রেক্ষাগৃহে আসবার সার্থকতা...

শেষ